মসীহ্
হিন্দুস্তান মেঁ

[ভারতবর্ষে ঈসা (আ.)]

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

মসীহ্
হিন্দুস্তান মেঁ
[ভারতবর্ষে ঈসা (আঃ)]

লেখক:
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান,
গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ [ভারতবর্ষে ঈসা (আঃ)]

Bengali Translation of 'Masih Hindustan Mein' (Urdu) by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani The Promised Messiah & Mahdi[as]

Translation into Bengali by the Maulana Ahmad Sadeq Mahmood Murabbi Silsilah

First Edition (Urdu): Printed in Qadian in 1908

First Edition (Bengali): Printed in Qadian in March, 2022

Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazl-e- Umar Printing Press,

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ' [ভারতবর্ষে ঈসা (আঃ)] গ্রন্থটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালাম ১৮৯৯ সালে উর্দু ভাষায় প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। যা সর্বপ্রথম ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি নতুন আঙ্গিকে কম্পোজ করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা। রিভিউ এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব শেখ মুহাম্মদ আলী, সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, জনাব রফিকুল ইসলাম (এম.এ) মুরুব্বী সিলসিলাহ্, জনাব মুহাম্মদ সাবির মোল্লা মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং সাজিদা খাতুন সাহেবা। গ্রন্থটির পরিমার্জন এবং সম্পাদন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান, ইনচার্য বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল্ মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

গ্রন্থটির প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন।

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির, নশর ও এশায়াত

কাদিয়ান
মার্চ ২০২২

দু'টি কথা

(বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা। সংক্ষেপিত)

'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' [ভারতবর্ষে ঈসা (আ.)] গ্রন্থটি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এপ্রিল, ১৮৯৯ ইং সালে প্রণয়ন করেন।

পবিত্র হাদীস অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের এক মহান উদ্দেশ্য হলো 'কাসরে-সলীব' তথা প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিমূল ক্রুশীয় বিশ্বাসকে খন্ডন করা। এ বিশ্বাসটি হচ্ছে, হযরত মসীহ্ (আ.) ক্রুশে মরে গিয়ে মানুষের জন্যে অভিশপ্ত হন যাতে তিনি তাদেরকে শরীয়তের লা'নত হতে মুক্ত করেন (গালাতীয়, ৩ঃ১৩)। পৌল আরও বলেন, 'যদি মসীহ্ জীবিত হয়ে উত্থিত না হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা' (১-করিন্থীয়, ১৫ঃ১৪)।

অতএব 'ক্রুশ ভঙ্গ করবেন' বলে প্রতিশ্রুত মসীহ্র বিরাট কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কাজেই তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তবাদের ভিত তথা খ্রীষ্টধর্মের প্রাণবিশেষ এই ক্রুশীয় বিশ্বাসটিকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নির্মূল করা আবশ্যক ছিল। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এ পুস্তক রচনার মাধ্যমে ক্রুশভঙ্গের আরব্ধ কাজটি অতি সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন করেন। এ পুস্তকে তিনি প্রকৃত ঘটনা ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য- প্রমাণ এবং অমুসলিম জাতিসমূহের প্রাচীন দলিল-পত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেন যে, হযরত মসীহ্ নাসেরী (আ.) ক্রুশীয় ঘটনার পরে ইঞ্জিলে বর্ণিত তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা অনুযায়ী ইস্রাঈলের হারানো দশ গোত্রের খোঁজে ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করেন এবং নসীবাস (Nasibus) ও ইরান হয়ে আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে তথা ভারতবর্ষে আগমন করেন। ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে মারা যান নি এবং আকাশেও যান নি। তাই কখনও আশাও করা উচিত নয় যে, তিনি আবার আকাশ থেকে নেমে আসবেন।

বরং তিনি একশ' বিশ বছর বয়স পেয়ে কাশ্মীরের শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেন। শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর সমাধি রয়েছে। হযরত মসীহ (আ.)-এর ভারতবর্ষ আগমন প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইঞ্জিল ছাড়াও মুসলিম ও অমুসলিম বিখ্যাত প্রণেতাদের ঐতিহাসিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন রেকর্ড-পত্র থেকেও প্রচুর তথ্য-প্রমাণ হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) উপস্থাপন করেন।

বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন রেকর্ড বা দলীল-দস্তাবেজ থেকে তথ্যাদি উদ্ধার করে একটা জটিল বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন তাঁর এই পুস্তকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি বলেন, হিন্দুস্তান ভ্রমণের সময় হযরত ঈসা (আ.) তিব্বতেও গিয়েছিলেন ইস্রায়েলের সেই 'হারানো মেষ'-এর সন্ধানে। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ধর্মান্তরিত ইহূদী। বুদ্ধদেবের অনুসারীরা যীশুর শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাঁকেই বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব অর্থাৎ তাদের প্রতিশ্রুত শিক্ষাদাতা বা মত্তিয়া বলে মনে করেছিল। তাদের প্রভু রূপে তাঁর (আ.) প্রতি ঈমান এনেছিল তারা এবং তাদের ধর্মীয় পুস্তকাবলীর শিক্ষার মধ্যে তাঁর (আ.) শিক্ষাকে মিশ্রিত করে ফেলে এবং সেগুলিকেও আরোপ করে বুদ্ধদেবের প্রতি। শিক্ষাকে মিশ্রিত করে ফেলে এবং সেগুলিকেও আরোপ করে বুদ্ধদেবের প্রতি। এর সমর্থনেও বহু তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের পুস্তকাবলী থেকে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থেও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোকে যেমন অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা অপনোদন করেছেন তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামের সুসংস্কৃত খাঁটি রূপকে, সঠিক ও অভ্রান্ত শিক্ষাকে। এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হওয়ার ঐশী দাবীসমুহকে।

এই পুস্তকে উপস্থাপিত তথ্যাদি এবং যুক্তি-প্রমাণ প্রচারিত হয়ে আসছে বিগত এক শতাব্দি কাল ধরে। এর প্রভাব মুসলিম মানসে এতোটাই প্রবলরূপে প্রতিভাত হয়ে চলেছে যে, এমন কি, কায়রোর আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এক ফতোয়া জারি করে বলেছেন যে, কুরআন করীমের মতে হযরত

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) সম্পূর্ণ স্বাভাবিকরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই শিক্ষা খৃষ্টান মানসেও আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে এবং অনেকেই যীশুর ঈশ্বর-পুত্র হওয়ার তথা ত্রিত্ববাদের ক্রুশীয় বিশ্বাসটাকে পরিত্যাগ করছেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এই পুস্তকটি লিখেছেন ১৮৯৯ইং সালে। আশ্চর্য হতে হয়, আজ থেকে ১০৫ বছর আগে তিনি যে সব প্রমাণ ও প্রামাণ্য দলিল-পত্রের উল্লেখ করেছেন এখনকার যুগের আধুনিক গবেষকগণ সেসব দলিল-পত্র গবেষণা করেই হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) প্রকৃত পথেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা জেনেই তাঁর বইটি লিখেছিলেন।

অবশেষে বিনীত দোয়া, আল্লাহ্‌তাআলা যেন পুস্তকখানা বাংলা ভাষাভাষী সত্যান্বেষী পাঠকবৃন্দের জন্য বরকতপূর্ণ ও ঈমান বৃদ্ধি এবং হেদায়াতের কারণ করেন।

খাকসার

মোবাশ্‌শেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ১৯ জুন, ২০০৪ইং

লেখক পরিচিতি

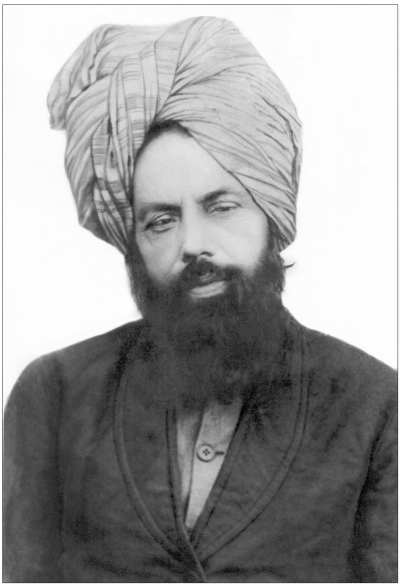

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ, ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ, ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের

যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-এর ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

সূচীপত্র

ভূমিকা	1
প্রথম অধ্যায়	
বাইবেল থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ	15
দ্বিতীয় অধ্যায়	
পবিত্র কুরআন ও প্রামাণ্য হাদীসাবলী থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ	54
তৃতীয় অধ্যায়	
চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য- প্রমাণ	61
চতুর্থ অধ্যায়	
ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য- প্রমাণ	71
প্রথম পরিচ্ছেদ :	
ইসলামী গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ যা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপক ভ্রমণ ও পর্যটনকে সাব্যস্ত করে	71
হযরত মসীহ্ (আ.)-এর ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ-পথ সংক্রান্ত নকশা	73
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	
বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ	78
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	
পাঞ্জাব ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় হযরত মসীহ্‌র অত্যাবশ্যক আগমন সম্পর্কে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে সাক্ষ্য- প্রমাণ	99
আবদালী চব্বিশটি গোত্রের বিবরণ	106

ٹائیٹل بار اول

حمد بیحد وقیاس اور لاانتہاو لامتناہی سپاس
خدائے رحیم وکریم ملک الجنۃ والناس
کہ گوہر بے بہا ونسخۂ کیمیا گم گشتگان کا رہنما
یعنی رسالہ

مسیح ہندوستان میں

سفتۂ الماس قلم اعجاز رقم حضرت مسیح الہند مرزا غلام احمد صاحب
قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام
درباره نجات مسیح ناصری از صلیب اور اُنکا سفر جانب ہندوستان
بتوفیق یزدانی وفضل ربّانی

مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان ضلع گورداسپور میں
باہتمام شیخ یعقوب علی صاحب تراب ایڈیٹر و
مالک مطبع طبع ہوکر ۲۰ نومبر ۱۹۰۸ء کو
شائع ہوا

تعداد اشاعت ۷۰۰ قیمت ۲ /

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

رَبَّنَا افۡتَحۡ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَ قَوۡمِنَا بِالۡحَقِّ وَاَنۡتَ خَیۡرُ الۡفٰتِحِیۡنَ

['হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সত্যের মাধ্যমে মীমাংসা করে দাও, তুমিই যে সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।- অনুবাদক]

ভূমিকা

এ পুস্তক আমি এ উদ্দেশ্যে লিখছি, যাতে প্রকৃত ঘটনা ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং অ-মুসলিম জাতিসমূহের প্রাচীন দলিল-পত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাথমিক ও পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলোর মাঝে ছড়িয়ে থাকা ভ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর ধ্যান-ধারণাকে দূর করি। এসব ধ্যান-ধারণা কেবল মহান স্রষ্টার তৌহীদকেই হরণ ও ধ্বংস করে না, বরং এ দেশের মুসলমানদের নৈতিকতার উপরও ক্রমাগত অত্যন্ত বিরূপ ও বিষাক্ত প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। এ ধরনের ভিত্তিহীন কেসসা-কাহিনীতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখায় অধিকাংশ মুসলিম ফির্কার মাঝে নৈতিক অবক্ষয়, সচ্চেতনা ও সদাচরণের অভাব, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতাসুলভ কঠিন আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। এদের মানবতাবোধ, দয়া-মায়া ন্যায়পরায়ণতা, বিনয় ও নম্রতা- এসব পবিত্র গুণ দৈনন্দিন এত দ্রুত লোপ পাচ্ছে, যেন এগুলো এখন শীঘ্র এদের কাছ থেকে বিদায় নিতে উদ্যত। হৃদয়ের এ কঠোরতা, নৈতিক অবক্ষয় ও নিষ্ঠুরতার দরুন বহু মুসলমানকেই এমন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, তাদের এবং হিংস্র জন্তুর মাঝে বোধ হয় খুব কমই পার্থক্য থাকতে পারে। একজন জৈন কিংবা বৌদ্ধ তো একটা মশা বা উকুন মারতেও ভয় পায় ও বিরত থাকে, কিন্তু আফসোস! আমাদের মুসলমানদের অনেকেই এমন, যারা কোন অন্যায় রক্তপাত ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ নাশের বেলায়ও সেই সর্বশক্তিমান খোদার

শাস্তিকে ভয় করে না, যিনি পৃথিবীর সকল জীবের তুলনায় মানুষের জীবনকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। এত হৃদয়হীনতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার কারণ কী? এর কারণ এটাই যে, শৈশবকাল থেকে এহেন কেস্‌সা-কাহিনী এবং অসঙ্গতভাবে জেহাদের অপব্যাখ্যা তাদের কানে দেয়া হয় ও তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যার দরুন ক্রমশ তাদের নৈতিক মূল্যবোধ নির্জীব হতে থাকে এবং তাদের অন্তর এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপের কদর্যকে আর অনুভব করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি কোন অসচেতন মানুষকে হত্যা করে ও তার পরিবার-পরিজনকে ধ্বংসের কবলে ফেলে দেয়, সে মনে করে সে যেন খুব বড় একটা পুণ্যের কাজ করেছে, বরং সে তার জাতির মাঝে গৌরব অর্জন করার এক সুযোগ লাভ করেছে বলে মনে করে। আর যেহেতু আমাদের দেশে এ জাতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে হিতোপদেশপূর্ণ ভাষণ দেয়া হয় না; দেয়া হলেও তা কপটতার ছদ্মাবরণে দেয়া হয়, সেহেতু জনসাধারণের মন-মানসিকতা ব্যাপকভাবে এসব মন্দ কার্যকলাপের সমর্থনের প্রতি ঝুঁকে আছে। কাজেই আমি আমার জাতির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দয়াপরবশ হয়ে ইতোপূর্বেও উর্দু ফার্সী ও আরবী ভাষায় একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করে তাতে প্রমাণ করেছি, মুসলমানদের মাঝে জেহাদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী ও রক্তপাতকারী এক ইমামের আগমনের জন্য অপেক্ষা এবং অপরাপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ সংক্রান্ত বিষয়- এ সবই হচ্ছে এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা উলামার অপব্যাখ্যা। নচেৎ ইসলামে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অথবা অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদান বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনভাবে ধর্মের জন্য অস্ত্রধারণের অনুমতি নেই। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলতে বুঝায়, শত্রুর আক্রমণে জীবননাশের আশংকায় যেসব যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। শরীয়তসম্মত জেহাদ কেবল এ তিন প্রকারের। এ তিন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার যুদ্ধ ইসলামে বৈধ নয়। মোটকথা, এ বিষয়ে আমার রচিত বই-পুস্তক প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আমি এ দেশে এবং আরব, সিরিয়া, খুরাসান ইত্যাদি অন্যান্য দেশেও বিতরণ করি। কিন্তু এখন আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এসব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা মানুষের মন থেকে উৎপাটন করার জন্য অকাট্য যুক্তি, সুস্পষ্ট প্রমাণ, নিশ্চিত উপাত্ত ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার হস্তগত হয়েছে। সেগুলোর

সত্যতার কিরণ আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছে, অচিরে এগুলোর প্রচার ও প্রসারের পর মুসলমানদের অন্তরে উল্লেখিত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটবে। আর আমি নিশ্চিত আশা রাখি, এসব সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার পর ইসলামের পুণ্যবান সন্তানদের হৃদয়ে সহিষ্ণুতা, উদারতা, বিনয়, নম্রতা ও দয়া-মায়ার মনোরম ও সুমিষ্ট ঝরণা প্রবাহিত হবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটার মাধ্যমে দেশ জুড়ে এক সুস্থ ও আশিসপূর্ণ প্রভাব পড়বে। তেমনি আমার দৃঢ়বিশ্বাস, খ্রীষ্টধর্মের গবেষকগণ এবং অন্যান্য সকল সত্য-পিপাসুরাও আমার এ পুস্তক দ্বারা উপকৃত হবেন। আর আমি যে এখনই বলে এসেছি, এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সেই ভুল সংশোধন করা, যা তাদের কোন কোন ধর্মবিশ্বাসে স্থান পেয়েছে, এটা কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে। অতএব তা আমি নিম্নে উপস্থাপন করছি।

জানা আবশ্যক, অধিকাংশ মুসলমান ও খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠে গেছেন। এ উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল থেকে এ বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে যে, হযরত ঈসা (আ.) এখনও জীবিত আছেন এবং শেষ যুগে কোন সময় পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসবেন। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এ উভয় দলের মাঝে মতপার্থক্য কেবল এতটুকু যে, খ্রীষ্টানদের মতে হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে মারা যান, তারপর পুনরায় জীবিত হয়ে সশরীরে আকাশে উঠে যান ও তার পিতার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) ডান পার্শ্বে গিয়ে বসেন, আবার শেষ যুগে পৃথিবীতে বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আসবেন। তারা আরও বলেন, পৃথিবীর স্রষ্টা ও প্রভু তথা খোদা সেই যীশু মসীহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়, আর তিনিই দুনিয়ার অন্তিম যুগে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের জন্য রুদ্রমূর্তিতে পৃথিবীতে নামবেন। তখন প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে তাকে বা তার মাকেও খোদা (উপাস্য) হিসেবে মেনে নেয় নি তাকে ধরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে। সেখানে কান্না-কাটি ও বিলাপ তার ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু উল্লেখিত ফির্কাগুলোর মাঝে মুসলমানরা বলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে বিদ্ধও হন নি এবং মারাও যান নি। বরং ক্রুশবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ইহুদীরা যখন তাঁকে আটক করলো তখন খোদার ফিরিশ্‌তারা তাঁকে সশরীরে

আকাশে তুলে নিলেন। আকাশে তিনি এখনও জীবিত আছেন। আর তাঁর অবস্থানস্থল হচ্ছে দ্বিতীয় আকাশ, যেখানে ইয়াহিয়া অর্থাৎ যোহনও রয়েছেন। সেই সাথে মুসলমানরা এ-ও বলেন যে, ঈসা (আ.) হচ্ছেন এক বিশেষ মর্যাদার নবী,তবে তিনি খোদা বা খোদার পুত্র নন। তারা এ-ও বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তিনি শেষ যুগে দু'জন ফিরিশ্তার কাঁধে ভর করে দামেস্কের মিনারার নিকট অথবা অন্য কোন জায়গায় অবতীর্ণ হবেন। এর পূর্বেই পৃথিবীতে বনী ফাতিমা বংশোদ্ভূত ইমাম মাহ্দী মুহাম্মদ মজুদ থাকবেন। হযরত মসীহ্ তাঁর সাথে মিলিত হয়ে একযোগে তারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল অমুসলিমকে হত্যা করবেন। যে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে মুসলমান হয়ে যাবে কেবল তাকে ছাড়া অন্য কাউকে জীবিত রাখবেন না। মোটকথা, মুসলমানদের মাঝে যে ফের্কা আহলে সুন্নত বলে পরিচিত অথবা আহলে হাদীস, যারা জনসাধারণের মাঝে ওহাবী নামে অভিহিত, তাদের মতে পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তিনি হিন্দুদের মহাদেবের ন্যায় গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন। প্রথমে মুসলমান হয়ে যাওয়ার জন্য ধমক দেবেন। তা সত্ত্বেও মানুষ কুফরীতে কায়েম থাকলে তাদের সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবেন। তারা বলেন, উক্ত উদ্দেশ্যেই তাঁকে পার্থিব দেহ সহ আকাশে জীবিত রাখা হয়েছে, যাতে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ার সময় নেমে এসে অমুসলিমদেরকে হত্যা করেন এবং বল প্রয়োগে মুসলমান করেন অথবা অস্বীকার করলে বধ করেন। বিশেষ করে খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে উল্লেখিত ফের্কাসমূহের আলেমরা বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন আকাশ থেকে নামবেন তখন দুনিয়ার সমস্ত ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন ও তলোয়ারের জোরে নির্মম কর্মকান্ড ঘটিয়ে পৃথিবীকে রক্তে ভরে দেবেন। এখনই যেমন আমি বলে এসেছি এরা অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে আহলে হাদীস ইত্যাদি ফের্কার লোকেরা খুব জোশের সাথে তাদের এ ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করে থাকে যে, ঈসা মসীহ্র অবতীর্ণ হবার কিছুকাল পূর্বে বনী ফাতিমা থেকে এক ইমাম জন্মলাভ করবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ মাহদী আর কুরায়েশ বংশোদ্ভূত হবার দরুন তিনিই প্রকৃতপক্ষে যুগ খলীফা ও বাদশাহ্ হবেন। তার প্রকৃত লক্ষ্যই হবে, কেবল এমন ব্যক্তি যে তখন তখনই কলেমা পড়ে নেয় সে ছাড়া ইসলামকে অস্বীকারকারী সকল জাতির

সকল অমুসলিমকে হত্যা করা, কাজেই তার সাহায্য-সহায়তার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। আর যদিও হযরত ঈসা (আ.) নিজেও একজন মাহ্দী বরং বড় মাহ্দী তিনিই, কিন্তু যুগ-খলীফার পক্ষে কুরায়েশ বংশোদ্ভূত হওয়া জরুরী বিধায় হযরত ঈসা (আ.) যুগ-খলীফা হবেন না, বরং যুগ-খলীফা উল্লেখিত মুহাম্মদ মাহ্দী হবেন। তারা আরও বলেন, এ দু'জন একত্র হয়ে পৃথিবীকে মানুষের রক্তে রঞ্জিত করে ফেলবেন। এত রক্তপাত করবেন যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সূচনা থেকে শেষ অবধি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসা মাত্র তারা রক্তপাত শুরু করে দেবেন। কোন হিতোপদেশও দান করবেন না এবং কোন নিদর্শনও দেখাবেন না। তারা আরও বলেন, যদিও হযরত ঈসা (আ.) ইমাম মুহাম্মদ মাহ্দীর জন্যে পরামর্শদাতা বা মন্ত্রীস্বরূপ হবেন এবং ক্ষমতার রাস মাহ্দীর হাতে থাকবে, কিন্তু হযরত মসীহ্ দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্দী মুহাম্মদকে সবসময় উস্কানী দেবেন ও চরম পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে পরামর্শ দিতে থাকবেন যেন সেই নম্রতা ও সদাচরণের নৈতিক শিক্ষার শোধ তোলেন, যা তিনি প্রথম আগমনকালে মানুষকে দিয়েছিলেন, যেমন- 'কোন অশিষ্টাচারের মুকাবিলা করো না এবং এক গালে চপেটাঘাত খেয়ে অপর গালটিও পেতে দাও'।

এসবই হলো হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস। যদিও একজন দুর্বল বিনম্র মানুষকে খোদা বলাটা খ্রীষ্টানদের এক বড় ধরনের ভুল, কিন্তু একজন রক্তপাতকারী ইমাম মাহ্দী ও রক্তক্ষরণকারী মসীহ্ (-এর আগমন) সম্পর্কে আহলে হাদীস ফির্কাসহ (যাদেরকে ওহাবীও বলা হয়) কিছু সংখ্যক অন্যান্য ফিরকার মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল এসব বিশ্বাস তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর অত্যন্ত মন্দ প্রভাব ফেলছে- এত বেশি মন্দ প্রভাব যে, এর কারণে তারা যেমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির মাঝে সচ্চেতনা ও সততার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাস করতে পারে না, তেমনি কোন ভিন্ন সরকারের অধীনেও সত্যিকার আনুগত্য ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে বসবাস করতে পারে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এত কঠিন বলপ্রয়োগের বিশ্বাস যে, তাদেরকে হয়তো তখন তখনই মুসলমান হতে হবে, নইলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এমন ধর্মবিশ্বাস যে নিতান্তই আপত্তিকর তা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে

পারেন। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনায়াসে স্বীকার করবেন, কারও কোন ধর্মের সত্যাসত্য যাচাই ও এর শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি করার এবং এর কল্যাণ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পূর্বেই কোন ব্যক্তিকে কেবল জোর-জবরদস্তি ও হত্যার হুমকির মাধ্যমে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় পন্থা। এরূপ পন্থায় ধর্মের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টো এর প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আপত্তি করার সুযোগ করে দেয়া হয়। এমন রীতি-নীতির শেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি অন্তর থেকে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। মানবতার মৌলিক চারিত্রিক গুণ দয়া, মায়া ও ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, আর এর পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহিত সাধন স্পৃহা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেবল হিংস্রতা অবশিষ্ট থেকে যায় এবং উচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। কিন্তু সুস্পষ্ট যে, ওরূপ রীতি-নীতি সেই খোদাতাআলার পক্ষ থেকে (গণ্য) হতে পারে না, যাঁর প্রত্যেক শাস্তি কেবল চূড়ান্তভাবে যুক্তি প্রতিষ্ঠার পরেই হয়ে থাকে। চিন্তা করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন সত্য ধর্মকে এজন্য গ্রহণ না করে যে, সে এর সত্যতা, এর পবিত্র শিক্ষা এবং এর সৌন্দর্য ও সদ্‌গুণাবলী সম্বন্ধে তখনও অজ্ঞ ও অপরিচিত, তাই বলে কি ওরূপ ব্যক্তির সাথে এ আচরণ সমীচীন হতে পারে যে, তখন তখনই তাকে হত্যা করা হয়? বরং ওরূপ ব্যক্তি তো করুণার পাত্র এবং তার অধিকার রয়েছে, যেন তার কাছে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে সে ধর্মের সত্যতা, গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্যকভাবে উপস্থাপন করা হয়। তার অস্বীকারের জবাব তলোয়ার অথবা বন্দকের মাধ্যমে দেয়া কখনও সঙ্গত নয়। অতএব এ যুগের এ সকল ইসলামী ফির্কার জিহাদ সংক্রান্ত মতবাদ আর সেই সাথে তাদের এ শিক্ষা যে, সেসময় আগত প্রায় যখন এক রক্তপাতকারী মাহ্‌দীর জন্ম হবে যার নাম হবে ইমাম মুহাম্মদ এবং মসীহ্ তার সাহায্যার্থে অকাশ থেকে নামবেন এবং উভয়ে মিলিত হয়ে দুনিয়ার সকল বিধর্মী জাতিকে ইসলাম অস্বীকার করার কারণে হত্যা করবেন- এহেন মতবাদ নিঃসন্দেহে চরম পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধী। এটা কি সেই ধর্ম বিশ্বাস নয় যা মানবতার সকল পবিত্র প্রবৃত্তিকে নস্যাৎ করে আর হিংস্র পশু-সুলভ প্রবৃত্তিগুলোর জন্ম দেয়? এহেন আকীদায় বিশ্বাসীদেরকে প্রত্যেক

জাতির সঙ্গে কপটতাপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য করে, এমন কি বিজাতীয় শাসকদের সাথে তাদের পক্ষে অকপট আনুগত্যপূর্ণ আচরণও অসম্ভব হয়ে পড়ে, বরং অসততা ও মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে এক অসত্য আনুগত্য দেখানো হয়। এ কারণেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায়- আগেই যেমন ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি- আহ্লে হাদীসদের কোন কোন ফির্কা * ইংরেজ সরকারের অধীনে দ্বিমুখী ধরনের (নীতি পালনে) জীবন যাপন করছেন, অর্থাৎ গোপনে তারা জনগণকে সে একই রক্তপাতের যুগের আশ্বাস দিতে থাকেন। তারা রক্তপাতকারী মাহ্দী ও রক্তক্ষরণকারী মসীহ্র জন্য অপেক্ষমান রয়েছেন, আর সে অনুযায়ীই মস্লা (বিধান) শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু শাসকদের সামনে আবার তোষামোদি ভূমিকায় উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমরা ওরূপ বিশ্বাসের বিরোধী।' কিন্তু তারা যদি সত্য সত্যই বিরোধী হয়ে থাকেন তাহলে কী কারণে তারা তাদের প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণভাবে এর প্রচার-প্রচারণা করেন না? আর কী কারণে তারা আগমনকারী খুনী মাহ্দী ও মসীহ্র জন্য এমনভাবে অপেক্ষা করছেন, যেন তাদের সাথে তাদের রক্তক্ষয়ী অভিযানে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে দোরগোড়ায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন? মোট কথা, উল্লেখিত বিশ্বাস এই শ্রেণীর মৌলবীদের যথেষ্ট নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছে। তারা মানুষকে নম্রতা, শালীনতা ও শান্তিপ্রিয়তার শিক্ষা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। বরং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে অহেতুক হত্যা করা ধর্মপরায়ণতার ক্ষেত্রে এক প্রধান কর্তব্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আহ্লে হাদীসের কোন ফির্কা এসব ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী হলে আমরা এতে অত্যন্ত আনন্দিত হব। কিন্তু আমি আফসোসের সাথে এ কথা বর্ণনা না করে পারছি না যে, আহ্লে হাদীসের মাঝে সেসব আত্মগোপনকারী ওহাবীও রয়েছেন যারা এক রক্তপাতকারী মাহ্দীর আবির্ভাবে ও জেহাদের তথাকথিত মতবাদে বিশ্বাস করেন। তারা

** টীকা ঃ আহ্লে হাদীসের কেউ কেউ অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে অন্যায়ভাবে নিজেদের রচিত বই-পুস্তকে লিখেছেন, অচিরে মাহ্দী আবির্ভূত হবেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসক ইংরেজদেরকে বন্দী করবেন। আর তখন খ্রীষ্টান বাদশাকে গ্রেফতার করে তার সামনে হাজির করা হবে। এসব পুস্তক এখনও এসব আহলে হাদীসের বাড়ী-ঘরে মজুদ রয়েছে। সেগুলোর মাঝে 'ইক্বতারাবুস সা'আ' হচ্ছে এক অতি বিখ্যাত আহ্লে হাদীস রচিত কিতাব। এর ৬৪ পৃষ্ঠায় এ বর্ণনাই লেখা আছে।- গ্রন্থকার*

এর প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সুযোগ মত অন্যান্য সকল ধর্মের সকল অনুসারীকে হত্যা করে ফেলা অনেক বড় পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। অথচ ইসলামের নামে হত্যা, রক্তপাত ও রক্তপাতের হুমকির মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ও উন্নতি সাধন করবেন এমন কোন খুনী মাহ্দী বা মসীহ্র আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে বিশ্বাস রাখা- এসবই কুরআন মজীদ ও সহী (প্রামাণ্য) হাদীসাবলীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়ায্যামায় এবং এর পরেও কাফিরদের হাতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। বিশেষত মক্কার তের বছর মহাবিপদ ও প্রত্যেক প্রকারের যুলুম-নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, যা কল্পনা করতেও কান্না আসে। কিন্তু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করেন নি এবং তাদের কঠোর গালমন্দের কঠোর উত্তরও দেন নি যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সংখ্যক সাহাবা, তাঁর প্রিয় বন্ধু ও ভক্তদেরকে বড়ই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা না করা হয় এবং বিভিন্নভাবে তাঁকেও দৈহিক কষ্ট না দেয়া হয়। আর কয়েক বার তাঁকে বিষও প্রয়োগ করা হয় এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য কয়েক প্রকারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যেগুলোতে বিরুদ্ধবাদীদেরকে বিফল মনোরথ হতে হয়। (অবশেষে) খোদাতাআলার প্রতিশোধ ও শাস্তি দানের সময় যখন এলো তখন এমনটি ঘটলো যে, মক্কার সকল প্রধান ও জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তি মিলিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে এ ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলা উচিত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তখন খোদাতাআলা, যিনি তাঁর প্রিয়দের এবং সত্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের সহায়ক হয়ে থাকেন তিনি তাঁকে জানান যে, এ শহরে এখন যেহেতু পাপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আর এর নাগরিকরা হত্যাযজ্ঞে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেহেতু তিনি যেন অনতিবিলম্বে এখান থেকে চলে যান। অতএব ঐশী আদেশে তখন তিনি মদীনায় হিজরত করে যান। কিন্তু তবুও তাঁর শত্রুরা তাঁর পিছু ছাড়ে নি। বরং তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং যে করেই হোক ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল। আর যখন তাদের বাড়াবাড়ি চরম সীমায় পৌঁছে গেল এবং বহু নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষকে হত্যা করার অপরাধেও তারা নিজেদেরকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য করে তুললো, তখন প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষামূলক অধিকাররূপে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। তদুপরি কোন

যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই শুধুমাত্র দুষ্কর্মপরায়ণ হয়ে বহুসংখ্যক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার এবং তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার দরুনও তারা নিজেরা ও তাদের সাহায্যকারীরা অনুরূপ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময়ে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) ধর্ম বিস্তারের জন্য কখনও যুদ্ধ করেছিলেন অথবা কাকেও জবরদস্তি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়েছিলেন এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল এবং অন্যায়।

এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, সেই যুগে যেহেতু ইসলামের প্রতি প্রত্যেক জাতি অতি মাত্রায় শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। বিরোধীরা একে একটি নূতন ধর্ম ও সংখ্যায় কেবল ক্ষুদ্র একটি দল ভেবে একে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা-তদ্বিরে মেতে উঠেছিল এবং উদ্‌গ্রীব ছিল মুসলমানরা যেন শীঘ্র ধ্বংস হয়ে যায় বা এরূপ ছিন্ন-ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, যাতে এর উন্নতি করার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে, সেহেতু সে সময় তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানরা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন। কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষা নিলে সে তার গোত্র কর্তৃক হয়ত তৎক্ষণাৎ নিহত হতো, নয়ত তার জীবন ভীষণ আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়তো। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌তাআলা নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সে শ্রেণীর শত্রুভাবাপন্ন শাসকদের ওপর 'খারাজ' (অর্থদন্ড) আরোপ করলেন যাতে তারা খারাজ পরিশোধে ইসলামের অধীনস্থ হয়ে যায়, আর এভাবে ইসলামের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। এর উদ্দেশ্য ছিল ঈমান আনয়নের পথ যেন বাধামুক্ত হয়। আর এটা ছিল দুনিয়ার প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার কৃপা। আর এতে কারও ক্ষতির কারণও ছিল না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান কালের অমুসলিম শাসকরা ইসলামের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা দেয় না। ইসলামের অবশ্যপালনীয় অনুশাসনে বাধা-নিষেধ আরোপ করে না। তাদের নিজেদের জাতির মধ্য থেকে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারীদেরকে হত্যা করে না। তাদেরকে কারাগারে ঢোকায় না। তাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে না। কাজেই ইসলাম কেনই বা তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ

করবে? এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম কখনও বল প্রয়োগের শিক্ষা দেয় নি। কুরআন করীম এবং হাদীস ও ইতিহাসের সব গ্রন্থে যদি গভীর দৃষ্টি দেয়া হয় এবং যথাসম্ভব গভীর মনোনিবেশে তা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করা হয়, তাহলে এভাবে সঞ্চিত এই ব্যাপক তত্ত্ব-তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে জানা যাবে, এ আপত্তি বা অভিযোগ যে ইসলাম নাকি জোর-জবরদস্তি ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও লজ্জাকর অপবাদ। এটা কেবল সেসব লোকের অলীক ধারণা যারা নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে কুরআন ও হাদীস এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাঠ করেনি, বরং পুরোপুরি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি সে যুগ এখন ঘনিয়ে আসছে যখন সত্যের জন্যে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানুষ এসব অপবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হবে। আমরা কি সে ধর্মকে বল প্রয়োগের ধর্ম নামে অভিহিত করতে পারি, যার কিতাব কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ রয়েছে ঃ লা ইকরাহা ফিদ্দীন অর্থাৎ 'ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোন জোর-জবরদস্তি বৈধ নয়'। আমরা কি সেই মহিমান্বিত নবীকে বলপ্রয়োগের এ অপবাদ দিতে পারি, যিনি মক্কা মুয়ায্যমায় তেরটি বছর ধরে তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে রাত দিন কেবল এ উপদেশই দিতে থাকেন, 'শত্রুর অনিষ্টের জবাব অনিষ্টের দ্বারা দিতে যেও না, বরং ধৈর্য ধর'। তবে যখন শত্রুর অনিষ্টের সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সকল জাতি তৎপর হলো, তখন ঐশী আত্মমর্যাদাবোধ মনস্থ করলো, যারা তলোয়ার ধারণ করে তাদেরকে যেন তলোয়ার দিয়েই হত্যা করা হয়। নচেৎ কুরআন করীম কক্ষনও জবরদস্তি করার শিক্ষা দেয় নি। যদি জবরদস্তি করার শিক্ষা থাকতো তাহলে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ জবর-দস্তির শিক্ষার কারণে পরীক্ষার ক্ষেত্রে খাঁটি ঈমানদারদের ন্যায় নিষ্ঠা প্রদর্শনের পরিচয় তুলে ধরতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের প্রভু ও অভিভাবক নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন এমন এক বিষয়, যা বর্ণনা করাও দরকার বলে মনে করি না। এ বিষয়টি কারও কাছেই গোপন নয়, তাদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন পর্যায়ের নমুনা ও দৃষ্টান্তের বহির্প্রকাশ ঘটেছে যার নজির অন্যান্য জাতির মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা এ

দলটি তরবারির ছায়ার নীচেও নিজেদের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠাকে কখনও বর্জন করে নি, বরং সর্বদা তাদের পবিত্র ও মহান নবীর সাহচর্যে থেকে তারা সেই নিষ্ঠা দেখিয়েছে যা মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত কখনও দেখাতে পারে না। মোট কথা, ইসলামে কোন বল-প্রয়োগের বিধান নেই। ইসলামের যুদ্ধসমূহ তিন প্রকারের, এর বাইরে নয় ঃ

১। প্রতিরোধস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মরক্ষামুলক অধিকারের ধারায়

২। শাস্তিস্বরূপ, অর্থাৎ রক্তের বিনিময়ে রক্ত ও

৩। স্বাধীনতা সংস্থাপন স্বরূপ, অর্থাৎ বল-প্রয়োগকারীদের পাশবিক শক্তিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে, যারা কারও স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়াতে তাকে হত্যা করতো। অতএব যেখানে ইসলামে কোন নির্দেশ নেই যে, কোন ব্যক্তিকে জবরদস্তি ও হত্যার হুমকির দ্বারা ধর্মে দীক্ষিত করা যায়, সেখানে কোন রক্তপাতকারী মাহ্দী অথবা রক্তক্ষরণকারী কোন মসীহ্র আগমনের জন্য অপেক্ষা করা নিতান্ত বাতুলতা এবং বেহুদা ধারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা সম্ভবই নয় যে, কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণে এমন কোন মহাপুরুষ আসবেন যিনি তলোয়ারের মাধ্যমে মানুষকে মুসলমান করেন। এ বিষয়টি মোটেই এমন কঠিন বিষয় নয়, যা বুঝতে কারও অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু নির্বোধ লোকদেরকে প্রবৃত্তির লোভ লালসা এ বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। কেননা আমাদের অধিকাংশ মৌলবী আত্মপ্রতারণার দরুন মনে করেন যে, মাহ্দীর যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে তারা এত ধন সম্পদ পাবেন যা তারা অবশেষে শামাল দিতেও পারবেন না।

যেহেতু এ দেশের অধিকাংশ মৌলবী অতি দারিদ্র-ক্লিষ্ট, সে কারণেও তারা অধীর আগ্রহে এরূপ মাহ্দীর জন্যে এ আশায় অপেক্ষমান যে, হয়ত এ উপায়েই তাদের প্রবৃত্তির প্রয়োজন মিটবে। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ মাহ্দীর আগমনকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে, এরা তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাকে তৎক্ষণাৎ কাফির আখ্যা দেয়। ফলে সে ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং আমিও এসব কারণেই এ লোকদের দৃষ্টিতে কাফির; কেননা আমি এহেন খুনি মাহ্দী ও খুনি মসীহের আগমনে বিশ্বাস করি না। বরং এসব বাজে বিশ্বাসকে অত্যন্ত অপছন্দ করি ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি। তবে তারা যে কল্পিত মাহ্দী ও কল্পিত মসীহ্র আগমনে বিশ্বাসী, কেবল তাকে

অস্বীকার করার কারণেই আমাকে কাফির ঘোষণা করা হয় নি, বরং এ কারণেও করা হয় যে, আমি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম (ঐশীবাণী) প্রাপ্ত হয়ে তাঁরই আদেশে সবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি যে, সেই প্রতিশ্রুত প্রকৃত মসীহ্ আমিই, যিনি প্রকৃতপক্ষে মাহ্দীও হবেন। তাঁর আগমনের সুসংবাদ ইঞ্জিল ও কুরআনে বিদ্যমান এবং হাদীসেও যার আগমন সম্পর্কে ওয়াদা দেয়া হয়েছে। তাকে অবশ্যই কোন তলোয়ার বা বন্দুক দেয়া হয়নি। খোদাতাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি নম্রতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতার সাথে সেই আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করি, যিনি সত্য খোদা, যিনি আদি, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয়, যিনি পরিপূর্ণ পবিত্রতা, পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ কৃপা ও পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী।

এ অন্ধকার যুগের 'আলো' আমিই। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুবর্তিতা করে, তাকে সেসব গর্ত ও গিরি-গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হবে যা অন্ধকারে বিচরণকারীদের জন্য শয়তান তৈরী করেছে। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি শান্তি ও সহিষ্ণুতার সাথে মানুষকে সত্য খোদার দিকে পথপ্রদর্শন করি এবং তাদের মাঝে ইসলামের নৈতিক অবস্থাবলীর পুনর্বাসন করি। তিনি আমাকে সত্যান্বেষীদের স্বস্তি লাভের জন্যে ঐশী নিদর্শনাবলীও দান করেছেন ও আমার সমর্থনে তাঁর বিস্ময়কর কর্মকান্ড দেখিয়েছেন এবং অদৃশ্যের বার্তা ও ভবিষ্যতকালের রহস্যাবলী আমার নিকট উন্মোচিত করেছেন। খোদাতাআলার পবিত্র গ্রন্থাবলী অনুযায়ী সত্যবাদীকে সনাক্ত করার প্রকৃত মানদন্ড এটাই। আর তিনি আমাকে পবিত্র সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও জ্ঞান দান করেছেন। এ কারণে সেই সকল মানবাত্মা আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে যারা সত্যকে চায় না এবং যারা অন্ধকারকে পছন্দ করে। কিন্তু আমি চাই, যেন আমার সাধ্যানুযায়ী মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করি। অতএব এ যুগে খ্রীষ্টানদের প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভূতি হচ্ছে সেই সত্য খোদার দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যিনি জন্ম, মৃত্যু ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি সকল প্রকার ত্রুটি হতে পবিত্র সেই খোদা যিনি সূচনাকালীন পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল বস্তু ও সত্তাকে গোলাকারে সৃষ্টি করে তাঁর প্রাকৃতিক বিধানে এ নির্দেশনা এঁকে দিয়েছেন যে, গোলাকারের ন্যায় তাঁর সত্তায়

একত্ব ও দিকবিহীন সমাকৃতি রয়েছে। কাজেই মৌলিকভাবে একক বস্তুগুলোর কোন একটিকেও ত্রিভুজ সৃষ্টি করা হয় নি। অর্থাৎ প্রারম্ভিকভাবে খোদাতাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যেমন- পৃথিবী, নভমন্ডল, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও মৌলিক পদার্থ সবই গোলাকার। তাদের গোলাকৃতি তৌহীদের দিকেই নির্দেশ দিচ্ছে। অতএব খ্রীষ্টানদের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি ও প্রকৃত ভালবাসা তাদেরকে সেই খোদাতাআলার দিকে পথ-প্রদর্শন করার চেয়ে বেশি আর কিছু হতে পারে না, যাঁর হাতে সৃষ্ট সকল বস্তু তাঁকে ত্রিত্ববাদ মুক্ত সাব্যস্ত করছে।

আর মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভূতি হচ্ছে, তাদের নৈতিক অবস্থার সংশোধন করা এবং একজন রক্তপাতকারী মসীহ্ ও মাহ্দী সম্পর্কে তাদের অন্তরে জমানো অলীক আশাকে নির্মূল করা। কেননা তা ইসলামী শিক্ষামালার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি এই মাত্র লিখে এসেছি, রক্তপাতকারী মাহ্দী এসে তলোয়ারের জোরে ইসলামকে বিস্তার দেবেন বলে বর্তমানকালের এক শ্রেণীর উলামার যে বিশ্বাস তা সবই কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। এগুলো কেবল প্রবৃত্তিমূলক কামনা বাসনা মাত্র। একজন সচ্চেতা ও সত্যপরায়ণ মুসলমানের পক্ষে এসব ধ্যান-ধারণা থেকে বিরত হওয়ার জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট, সে যেন কুরআনের নির্দেশাবলীকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এবং একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করে, কোনো ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য হত্যার হুমকি দেয়া খোদাতাআলার পবিত্র কালামের কত বিরোধী। মোটকথা, কেবল এ একটি যুক্তি-প্রমাণই ওরূপ বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার সহানুভূতির তাড়নায় মনস্থ করেছি, উল্লেখিত বিশ্বাসের খন্ডনে ঐতিহাসিক ঘটনা, তত্ত্ব-তথ্য ইত্যাদি থেকেও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। আমি এ পুস্তকে প্রমাণ করবো, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি এবং আকাশেও যাননি। আর কখনও এ আশাও করা উচিত নয় যে, তিনি আবার পৃথিবীতে আকাশ থেকে নেমে আসবেন। বরং তিনি একশ'বিশ বছর বয়সে কাশ্মীরের শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেন। শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর রয়েছে।

সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে গবেষণার এ বিষয়টিকে আমি দশটি

অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত করেছি ঃ

(১) এ বিষয়ে ইঞ্জিলের সাক্ষ্য-প্রমাণ,

(২) কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের সাক্ষ্য-প্রমাণ,

(৩) চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্য-প্রমাণ,

(৪) প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্য-প্রমাণ,

(৫) সেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ যা ধারাবাহিকভাবে মুখে মুখে চলে আসছে,

(৬) সর্বস্বীকৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থাসূচক সাক্ষ্য-প্রমাণ,

(৭) যুক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ,

(৮) আমার প্রতি সদ্য অবতীর্ণ ঐশীবাণী (ওহী-ইলহাম) লব্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণ - এ হলো আটটি অধ্যায়।

(৯) নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে খ্রীষ্টধর্মের সাথে ইসলামের শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ইসলাম ধর্মের সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরা হবে।

(১০) দশম অধ্যায়ে সেসব বিষয়ের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে যেজন্য আল্লাহ্তাআলা আমাকে আদিষ্ট করেছেন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আমার প্রেরিত ও মসীহ্ মাওউদ হবার কী প্রমাণ তা বর্ণনা করা হবে। সবশেষে এ পুস্তকের উপসংহার থাকবে, যাতে কিছু জরুরী হেদায়াত ও নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হবে।

পাঠক সমীপে প্রত্যাশা, তাঁরা যেন এ পুস্তকটি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। অহেতুক কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিবেশিত এসব সত্যকে দূরে ঠেলে না দেন। স্মরণ রাখবেন, এ কোন ভাসা-ভাসা গবেষণা নয়, বরং এ পুস্তকে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ অত্যন্ত গভীর তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ। আমি দোয়া করি, যেন আল্লাহ্তাআলা এ কাজে আমাদের সহায়ক হন এবং তাঁর বিশেষ 'ইলহাম' ও 'ইলকা' দ্বারা সত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতিঃ আমাদেরকে দান করেন। কেননা সঠিক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট মা'রেফত (ঐশী সূক্ষ্মতত্ত্ব)-ও কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তাঁর দেয়া শক্তির মাধ্যমেই হৃদয়কে পথ-প্রদর্শন করা হয়। আমীন, সুম্মা আমীন।

বিনীত - মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৯ইং

প্রথম অধ্যায়

ইঞ্জিল থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ

জানা আবশ্যক, খৃষ্টানগণ যদিও বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ইহুদা ইস্ক্রিউতির বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে গ্রেফতার হবার পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান, এবং পুনরুত্থিত হয়ে আকাশে চলে যান। কিন্তু পবিত্র ইঞ্জিলে গভীর দৃষ্টিপাতে তাদের এ ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। অতএব মথি লিখিত ইঞ্জিলে (১২ অধ্যায়, ৪০ শ্লোকে) লেখা আছেঃ

> 'ইউনুস নবি যেমন তিন দিন তিন রাত মাছের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিন তিন রাত মাটির গর্ভে অবস্থান করবে।'

এখন স্পষ্ট যে, ইউনুস (আ.) মাছের পেটে অবস্থানকালে মারা যাননি। বরং বড় জোর কেবল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। খোদার পবিত্র গ্রন্থাবলী সাক্ষ্য দেয়, ইউনুস (আ.) খোদার অনুগ্রহে মাছের পেটে জীবিত ছিলেন এবং সেখান থেকে জীবিতাবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন। আর অবশেষে তাঁর জাতি তাঁকে গ্রহণ করে নেয়। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) যদি মাটি-গর্ভে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে জীবিতের সাথে মৃতের কিবা সাদৃশ্য এবং মৃতের সাথে জীবিতেরই বা কী তুলনা! বরং প্রকৃত ঘটনা হলো, মসীহ্ যেহেতু একজন সত্য নবী ছিলেন এবং জানতেন, তিনি যে খোদার প্রিয়, সে খোদা তাঁকে অভিশপ্ত মৃত্যু হতে রক্ষা করবেন। সেজন্যেই খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে তিনি এক উপমার আকারে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর এতে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যাবেন না, অর্থাৎ অভিশপ্ত কাষ্ঠে তাঁর মৃত্যু ঘটবে না। বরং ইউনুস নবীর ন্যায় কেবল তাঁর চৈতন্যলোপ পাবে। উপমাটিতে হযরত মসীহ্ (আ.) এদিকেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, মাটি-গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জাতির সাথে পুনরায় মিলিত হবেন এবং ইউনুস (আ.)-এর ন্যায় জাতির মাঝে সম্মান পাবেন।

সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণীটিও পূর্ণ হয়েছে। কেননা মসীহ্ (সা.) 'মাটির গর্ভ' থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর জাতির সেই সব গোত্রের দিকে যান যারা কাশ্মীর ও তিব্বত ইত্যাদি প্রাচ্য দেশগুলোতে বসবাসরত ছিল অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের সেই দশটি গোত্র, যাদেরকে খৃষ্টপূর্ব ৭২১* এসুর (Assur)- এর রাজা শালম্যানসর (Shalmeneser) সামেরিয়া থেকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তারা অবশেষে ভারতবর্ষের দিকে আসে এবং এ দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসরত থাকে। মসীহ্ (আ.)-এর পক্ষে এ সফর অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক ছিল। কেননা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নবুয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যেন সেই হারানো ইহুদীদের সাথে মিলিত হন যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছিল।

কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে 'ইস্রাঈলের এই হারানো মেষ' ছিল যারা এসব দেশে আসার পর নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মও ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এমন কি, এরপর ক্রমে ক্রমে তারা প্রতিমা-পূজারীতে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং ডঃ বার্নিয়ারও ** তাঁর রচিত সফরনামা পুস্তকে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তির উদ্ধৃতি সূত্রে বর্ণনা করেন, কাশ্মীরের বাসিন্দারা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইহুদী, যারা এসুর সম্রাট কর্তৃক সংঘটিত বিপর্যয়ের সময়ে এ দেশে চলে এসেছিল।

মোট কথা, হযরত মসীহ্ (আ.)-এর পক্ষে সেই সকল হারানো মেষের খোঁজ করা অত্যাবশ্যক ছিল যারা এ দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষে আসার পর অন্যান্য জাতির মাঝে মিশে গিয়েছিল।

হযরত মসীহ্ যে ভারতবর্ষে আসেন তারপর পর্যায়ক্রমে কাশ্মীরে পৌঁছেন এবং বৌদ্ধদের মাঝে ইস্রাঈলের হারানো মেষগুলোকে খুঁজে বের করেন, আর তারা যে অবশেষে তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ ও বরণ করে নেয়,

** টীকা ঃ এরা ছাড়া অন্যান্য ইহুদীরাও বেবিলনীয় বিপর্যয়ের কারণে প্রাচ্য দেশগুলোর দিকে নির্বাসিত হয়। - গ্রন্থকার*

***টীকা ঃ দেখুন, ফ্রান্সবাসী ডঃ বার্ণিয়ের রচিত 'সফর বৃত্তান্ত', ২য় খন্ড/ (Travels by Dr. Bernier Vol.II)*

যেভাবে হযরত ইউনুসকে তাঁর জাতি বরণ করে নিয়েছিল, এর প্রমাণ আমি পরবর্তীতে উপস্থাপন করবো। তবে এমনটি হওয়া এ কারণেও আবশ্যকীয় ছিল যে, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্ স্পষ্টত ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁকে ইস্রাঈলের হারানো মেষগুলোর উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে।

তাছাড়া, ক্রুশের মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া তাঁর পক্ষে এজন্যেও জরুরী ছিল যে, পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে ঃ 'ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে যে মারা যায় সে অভিশপ্ত।' বস্তুত লা'নত (অভিশাপ) শব্দটি এমন এক অর্থ বহন করে যা হযরত ঈসা মসীহ্র ন্যায় মহান ব্যক্তির প্রতি এক মুহূর্তের জন্যেও আরোপ করা ভীষণ অন্যায় ও অবিচার। কেননা সকল ভাষাবিদের সর্বসম্মত মতে লা'নতের অন্তর্নিহিত মর্ম হৃদয় সম্পর্কিত এক অবস্থাকে বোঝায়। এমন অবস্থাতেই কাউকে মালউন (অভিশপ্ত) বলা হবে যখন প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয় খোদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর অন্তর ঐশী কৃপা বঞ্চিত ও ঐশী ভালবাসা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞানে কপর্দক-শূন্য ও শয়তানের ন্যায় অন্ধ ও অবাঞ্ছিত হয়ে বিপথগামীতার হলাহলে ভরে যায়। আর তার মাঝে ঐশী-প্রেম ও তত্ত্ব-জ্ঞানের আলো কণা পরিমাণও অবশিষ্ট থাকে না। বিশ্বস্ততার সকল বাঁধন ছিন্ন হয়ে খোদা ও তার মাঝে একে অন্যের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন কি, সে খোদার শত্রু ও খোদা তার শত্রু এবং সে খোদার বৈরী ও খোদা তার বৈরী হয়ে যান। মোট কথা, সে শয়তানের সকল গুণ ও স্বভাবকে নিজের মাঝে ধারণ করে নেয়। আর এজন্যেই শয়তানকে 'লায়ীন' (অভিশপ্ত) বলা হয়।*

অতএব 'মাল্উন' বলতে যে অর্থ বোঝায় তা এত ঘৃণ্য ও অপবিত্র যে স্পষ্টত এটা কোনভাবেই কোন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না যিনি তাঁর অন্তরে খোদাতাআলার ভালবাসা রাখেন। আফসোস! খৃষ্টানগণ এ ধর্মবিশ্বাসটা আবিষ্কার করার সময় লা'নত শব্দের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করেন নি। নইলে তাদের পক্ষে এমন খারাপ শব্দ মসীহ্ (আ.)-এর ন্যায় পুণ্যবানের জন্যে ব্যবহার করা কখনও সম্ভব ছিল না। আমরা কি

** টীকা ঃ লিসানুল আরব, সিহাহ্ জওহারী, কামুস মুহিত, তাজুল উরস ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।*

বলতে পারি, হযরত মসীহ্র ওপর কখনও এমন সময় এসেছিল যখন তাঁর অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে খোদা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল ও তিনি তাঁকে অস্বীকার করে বসেছিলেন এবং খোদার প্রতি তিনি বৈরী এবং খোদার শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন? আমরা কি ভাবতে পারি, মসীহ্র হৃদয় কখনও অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল যে, তিনি খোদার সাথে সম্পর্কচ্যুত এবং কুফরী ও অস্বীকারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন? কিন্তু মসীহ্র অন্তরের যদি কখনও সেরূপ অবস্থা ঘটে না থাকে, বরং তাঁর হৃদয় সব সময় আল্লাহ্র ভালবাসা ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে ভরপুর ছিল, তা হলে হে প্রজ্ঞাবান লোকেরা! অবশ্যই এটা ভাববার বিষয়, আমরা কি কখনও একথা বলতে পারি যে, মসীহ্র হৃদয়ে কেবল একটি নয়, বরং হাজার হাজার অভিশাপ সকল বৈশিষ্ট্যসহ বর্ষিত হয়েছিল? 'মাআযাল্লাহ্' (আল্লাহ্র আশ্রয় চাই)। এমনটি অবশ্যই কখনও ঘটে নি। কাজেই আমরা কী করে বলতে পারি, তিনি নাউযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত হয়েছিলেন? অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, মানুষ যখন মুখ দিয়ে একটি কথা বলে ফেলে বা একটি বিশ্বাসে স্থির হয়ে যায়, এরপর সে বিশ্বাসের অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে গেলেও ওটাকে সে কখনও আর ছাড়তে চায় না।

'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করার আকাঙ্খা যদি কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তবে তা এক প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু পরিত্রাণ লাভের এটা কোন্ ধরনের আকাঙ্খা যার দরুন একটি সত্যকে টুটি চেপে হত্যা করা হয় এবং একজন পবিত্র নবী ও মহামানব সম্পর্কে এ বিশ্বাস স্থির করা হয়, তাঁর ওপর যেন এমন মুহূর্তও এসেছিল যখন খোদাতাআলার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সাথে তার একাত্মতা ও ঐকান্তিকতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা ও বৈরিতার সৃষ্টি হয়েছিল আর তার অন্তরে আলোর পরিবর্তে আঁধার ছেয়ে গিয়েছিল?

এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক, ওরূপ ধারণা কেবল হযরত মসীহ্ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের মর্যাদা বিরোধীই নয়, বরং ইঞ্জিলের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখকৃত তাঁর দাবী অনুযায়ী তাঁর মহত্ব ও পবিত্রতা, তাঁর ঐশী-প্রেম ও তত্ত্ব জ্ঞানেরও বিরোধী। ইঞ্জিল পড়ে দেখুন, হযরত ঈসা (আ.) স্পষ্টাক্ষরে

দাবী করেন, 'আমি পৃথিবীর আলো; আমি পথপ্রদর্শক; আমি খোদার সাথে উচ্চ পর্যায়ের প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ; আমি তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র জন্মলাভের অধিকারী এবং আমি তাঁর প্রিয় পুত্র'।

অতএব এ সকল অবিচ্ছেদ্য ও পবিত্র সম্পর্কাবলী সত্ত্বেও লা'নতের অপবিত্র মর্ম কী করে মসীহ্র হৃদয়পটে প্রযোজ্য হতে পারে? কখনও হতে পারে না। কাজেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত, হযরত মসীহ্ (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি। কেননা তাঁর সত্তা ক্রুশীয় ফলাফল হতে পবিত্র। আর ক্রুশীয় মৃত্যু হয় নি বলেই লা'নতের মর্মগত না-পাক অবস্থা থেকে নিঃসন্দেহে তাঁর অন্তরকে রক্ষা করা হয়েছিল। আর এথেকে নিশ্চিৎ ফল এ-ও দাঁড়াল যে, কখনও তিনি আকাশে যান নি। কেননা আকাশে যাওয়া এ পরিকল্পনার অংশ ও তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার শাখাবিশেষ ছিল। অতএব যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, তিনি অভিশপ্ত হন নি, তিন দিনের জন্য নরকেও যাননি এবং মারাও যাননি, তখন এর অপর অংশটিও অর্থাৎ আকাশে যাওয়া বাতিল সাব্যস্ত হলো।

এ সম্পর্কে ইঞ্জিল থেকে বর্ণিত আরও যুক্তি-প্রমাণ আমি নিম্নে তুলে ধরছি। যেমন, হযরত মসীহ্র মুখ নিঃসৃত একটি বাণী হলো,

> 'আমি পুনরায় জীবিত হয়ে উঠার পর তোমাদের পূর্বেই গালীলে যাব' (মথি, ২৬ঃ৩২)।

এ বাণীতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মসীহ্ কবর থেকে বের হয়ে গালীলের দিকে গিয়েছিলেন, আকাশের দিকে নয়। আর 'আমি পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার পর' মসীহ্র এ কথা দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে বুঝাতে পারে না। বরং ইহুদীদের ও সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তিনি যেহেতু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন, সেহেতু মসীহ্ (আ.) পূর্ব থেকে তাদের ভবিষ্যৎ ধারণা লক্ষ্য করে তাঁর উক্তিটিতে এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় ও তার পায়ে হাতে পেরেক ঢোকানো হয় যার ফলে অবশেষে সে অজ্ঞান হয়ে মৃতের ন্যায় হয়ে যায়, সে যদি ওরূপ কঠিন আঘাত থেকে উদ্ধার পেয়ে পুনরায় জ্ঞান ফিরে

পায় তাহলে তাঁর সম্পর্কে এমনটি বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, সে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছে। আর তাই এ মারাত্মক আঘাতের পরও হযরত মসীহ্ (আ.)-এর বেঁচে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক মুজিযা (অলৌকিকত্ব) ছিল। এ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তবে এতে মসীহ্র মৃত্যু ঘটেছিল বলে ধারণা করা সত্য নয়, যদিও ইঞ্জিলগুলোতে এমন কথার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তা ইঞ্জিল রচয়িতাদের সে ধরনেরই ভুল-ত্রুটি, যেমন অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক ঘটনা লিখতে গিয়ে তারা ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ইঞ্জিলগুলোর বিশদ গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যাদাতারা স্বীকার করেছেন যে, ইঞ্জিলগুলোর দু'টি অংশ রয়েছে ঃ

১- একটি হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা যা হযরত মসীহ্র পক্ষ থেকে তাঁর শিষ্যরা পেয়েছিলেন। এ অংশটিই হলো ইঞ্জিলের প্রাণ।

২- দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। যেমন, হযরত ঈসা (আ.)-এর বংশতালিকা, তাঁর গ্রেফতার হওয়া, প্রহৃত হওয়া, মসীহ্র সময়কার অলৌকিক কান্ডবিশিষ্ট এক পুকুরের বৃত্তান্ত ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে সেসব বিষয় যা ইঞ্জিল রচয়িতারা নিজ পক্ষ থেকে লিখেছিলেন। এগুলো ঐশীবাণী লব্ধ নয়, বরং লেখকগণ নিজ খেয়াল অনুযায়ী লিখেছেন। আর কোন কোন জায়গায় সীমা ছাড়িয়ে অতিশয়োক্তিও করেছেন। যেমন, এক জায়গায় লিখেছেন, মসীহ্র সকল কার্য তথা অলৌকিক ক্রিয়া যদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হতো তবে সে-সব গ্রন্থ জগৎ জুড়ে সংকুলান হতে পারতো না। এ যে কত বিরাট অতিশয়োক্তি!

তাছাড়া, মসীহকে যে কঠিন বিপদ আঘাত হেনেছিল তা 'মৃত্যু' শব্দের দ্বারা অভিহিত হওয়া ভাষাগত বাগধারা বিরোধী নয়। প্রায় প্রত্যেক জাতির মাঝে এ বাগধারাই প্রচলিত, কোন ব্যক্তি মারাত্মক কোন বিপদে কবলিত হবার পর পরিশেষে রক্ষা পেলে তার ক্ষেত্রে বলা হয়, 'সে পুনরায় জীবিত হয়েছে।' কোন জাতি ও দেশের বাগধারায় প্রচলিত এরকম বোল-চালে মোটেও কোন আপত্তির অবকাশ নেই।

উল্লেখিত এ সব বিষয়ের পর আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, সম্ভবত ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও লভ্য বার্নাবাসের ইঞ্জিলে লেখা আছে, মসীহ্ (আ.)

ক্রুশবিদ্ধ হন নি এবং এতে মারাও যাননি। অতএব, এ থেকে আমরা বলতে পারি, যদিও এ গ্রন্থটিকে (প্রচলিত) ইঞ্জিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং কোন বিধিসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়াই একে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ একটি প্রাচীন গ্রন্থ এবং সে সময়কার গ্রন্থ যখন অন্যান্য ইঞ্জিলগুলোও রচিত হয়। এ প্রাচীন গ্রন্থটিকে প্রাচীন যুগের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিবেচনা করে এথেকে উপকৃত হবার অধিকার কি আমাদের নেই? অথচ এ গ্রন্থ পাঠে আমরা কি অন্তত এ কথা বলতে পারি না যে, হযরত মসীহ্ (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন বলে তখনকার সকল মানুষ একমত ছিলেন না? তদুপরি এ চার ইঞ্জিলেও যেখানে এমন আলঙ্কারিক ও রূপক শব্দাবলী বিদ্যমান, যেমন কোন মৃতের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সে ঘুমাচ্ছে, সে মারা যায় নি', সেখানে কারও অজ্ঞান অবস্থায় তাকে মৃত বললে কি অযৌক্তিক হবে? আমি লিখে এসেছি, নবী কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। মসীহ্ (আ.) যেহেতু তাঁর কবরে অবস্থান করার তিন দিনকে ইউনুস (আ.)-এর তিন দিনের সাথে তুলনা করেছেন। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস যেমন তিনদিন মাছের পেটে জীবিত ছিলেন, তেমনি হযরত মসীহ্ও তিন দিন কবরে জীবিত ছিলেন। বস্তুত ইহুদীদের মাঝে তখনকার কবর এ যুগের কবরের মত ছিল না বরং সেগুলো কক্ষের ন্যায় ভেতরে বেশ প্রশস্ত হতো। আর এগুলোর এক দিকে জানালা থাকতো যা বড় পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। আমি শীঘ্রই যথাস্থলে প্রমাণ করবো, হযরত ঈসা (আ.)-এর যে কবরটি সম্প্রতি শ্রীনগরে আবিষ্কৃত হয়েছে তা অবিকল সে ধরনেরই কবর যে ধরনের কবরে হযরত ঈসা (আ.)-কে মুর্ছিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

মোটকথা, পূর্বোল্লেখিত শ্লোকটিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মসীহ্ কবর থেকে বের হয়ে গালীলের দিকে গেলেন। আর মার্কের ইঞ্জিলে লেখা আছে যে, 'তাঁকে কবর থেকে বেরিয়ে গালীলের সড়ক দিয়ে যেতে দেখা গেল, আর পরিশেষে তিনি সেই এগারো জন শিষ্যের সাথে মিলিত হলেন যারা তখন খাবার খাচ্ছিল। তিনি তাদেরকে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হাত ও পা দেখালেন। তারা ধারণা করলো, 'হয়তো এ কোন আত্মা হবে।' তিনি বললেন, 'আমাকে ছুঁয়ে দেখ। কেননা আত্মার দেহ ও হাড় থাকে না, অথচ আমাতে তোমরা দেহ ও হাড় দেখতে পাচ্ছ।' আর তিনি তাদের কাছ থেকে একটা

ভাজা মাছের টুকরো ও এক চাক মধু নিলেন এবং তাদের সামনে তা খেলেন।' দেখুন, মার্ক ১৬ঃ১৪; লুক ২৪ঃ৩৯-৪২।

এসব শ্লোক থেকে নিশ্চিৎ জানা যায়, হযরত মসীহ্ কখনও আকাশে যান নি, বরং কবর থেকে বের হয়ে গালীলের দিকে যান এবং তিনি স্বাভাবিক মানব দেহে ও সাধারণ কাপড়ে মানুষের মতই ছিলেন। যদি তিনি মারা যাবার পর পুনরুত্থিত হতেন তাহলে তাঁর সেই জালালী (ঐশ্বরিক) দেহ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ক্ষত চিহ্নগুলো কী করে বহন করতে পারতো? আর রুটি খাওয়ার বা তাঁর কী প্রয়োজন ছিল? খাওয়ারই যদি প্রয়োজন থাকতো তাহলে সে প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান।

পাঠকগণ যেন ধোঁকায় না পড়েন, ইহুদীদের ক্রুশ বুঝি এ যুগের ফাঁসির মত ছিল, যার থেকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা, সেই যুগের ক্রুশে কোন দড়ি (অপরাধীর) গলায় জড়ানো হতো না এবং তাকে ফাঁসি কাষ্ঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়াও হতো না। বরং ক্রুশে শুধু তার হাতে ও পায়ে পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া হতো। এভাবে ক্রুশ বিদ্ধ করার পর দু'এক দিনের মাঝে কাউকে রেহাই দেয়ার ইচ্ছা থাকলে সেটুকু শাস্তিই যথেষ্ট মনে করে তার হাড়গোড় চূর্ণ করার আগে তাকে জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো সম্ভব হতো। আর মেরে ফেলাই যদি স্থির করা হতো তাহলে অন্তত তিন দিন পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়া হতো এবং পানি ও খাবার কোন কিছু তার কাছে পৌঁছতে দেয়া হতো না। সেভাবেই তাকে রোদে তিন দিন বা তার চেয়েও বেশি পড়ে থাকতে ছেড়ে দেয়া হতো। এরপর তার হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়া হতো। এ যাবতীয় কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করার পর সে মারা যেতো। কিন্তু খোদাতাআলা তাঁর অপার অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ (আ.)-কে জীবনাবসান ঘটাতে পারে সে পর্যায়ের ক্লেশ ও যাতনা থেকে রক্ষা করলেন। একটু গভীর দৃষ্টিতে ইঞ্জিলগুলো পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন, হযরত মসীহ্ (আ.) তিন দিন ক্রুশে অবস্থান করেন নি। তিন দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টও তাঁকে ভোগ করতে হয় নি এবং তাঁর হাড়গোড়ও ভাঙ্গা হয় নি। বরং তিনি প্রায় দু'ঘন্টা মাত্র ক্রুশে অবস্থান করেন এবং খোদাতাআলার কৃপা ও অনুগ্রহে এমন উপক্রম ঘটে যে, দিনের শেষাংশে

তাঁকে ক্রুশে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে দিন ছিল শুক্রবার এবং দিনের মাত্র অল্প কিছু সময় বাকি ছিল। এর পরেই সাবাতের দিনের সূচনা ও ইহুদীদের 'ফাসাহ্' উৎসব ছিল। কাউকে সাবাত বা সাবাতের রাতে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়া ইহুদীদের রীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য হোত। মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীরাও চান্দ্র দিনপঞ্জী মেনে চলতো এবং দিনের গণনা এর পূর্বের রাত থেকে করতো। অতএব একদিকে প্রকৃতিগত জাগতিক কারণে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। আর অন্য দিকে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে স্বর্গীয় উপকরণ সৃষ্টি হলো। যখন ষষ্ঠ প্রহর, তখনই এমন এক তীব্র ধূলি-ঝড় উপস্থিত হলো যার ফলে তিন ঘন্টার জন্য সর্বত্র অন্ধকার ছেয়ে গেল (মার্ক ১৫ঃ৩৩)। এ ষষ্ঠ প্রহর ছিল বারোটার পর অর্থাৎ সন্ধ্যা নেমে আসার কাছাকাছি সময়ে। তখন অন্ধকারের তীব্রতায় ইহুদীরা চিন্তায় পড়ে গেল, পাছে সাবাতের রাত শুরু হয়ে যায় বিধায় তারা সাবাতের (পবিত্রতা ভঙ্গের) অপরাধের জন্য শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়ে। সেজন্য তারা শীঘ্র মসীহ্কে ও তাঁর সাথে দুজন চোরকেও ক্রুশ থেকে নামিয়ে দিল।

এর পাশাপাশি আরেকটি স্বর্গীয় কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, পীলাত যখন বিচারাসনে বসা ছিল তখন তার স্ত্রী তাকে বলে পাঠালেন, 'তুমি এ সত্যবাদীর ব্যাপারে মোটেও নাক গলাবে না (অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টিত হবে না) কেননা আমি আজ রাতে তার কারণে স্বপ্নে অনেক কষ্ট পেয়েছি' (মথি ২৭ঃ১৯)। কাজেই পীলাতের স্ত্রীকে স্বপ্নযোগে যে ফিরিশ্তা দেখানো হয়েছিল এতে আমরা তথা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই নিশ্চিৎ অনুধাবন করবেন, মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে মারা যান তা খোদা কখনও চাননি। দুনিয়ার সৃষ্টি কাল থেকে আজ অবধি খোদাতাআলা কোন ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য স্বপ্নে কাউকে অনুপ্রেরণা দিলে তার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কখনও ঘটেনি। যেমন, মথির ইঞ্জিলে লেখা আছে, প্রভুর এক ফিরিশ্তা স্বপ্নে ইউসুফের কাছে এসে বললো,

> 'উঠ! এ শিশু-পুত্র ও এর মাকে সাথে নিয়ে মিশরে চলে যাও এবং সেখানে আমি তোমাকে সংবাদ না দেয়া পর্যন্ত অবস্থান কর, কেননা হেরড তাকে হত্যা করার জন্য খুঁজবে।' (মথি ২ঃ১৩)।

এ ক্ষেত্রে কি বলতে পারেন, যীশু মিশরে পৌঁছে মারা যেতে পারতেন? তেমনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে পীলাতের স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখানোও ঐশী তদ্বিরের অংশ বিশেষ ছিল। আর এ তদ্বির ব্যর্থ হতে পারে তা কখনও সম্ভব ছিল না। মিশরে প্রবাসকালে মসীহ্র নিহত হওয়ার আশঙ্কা করা যেমন আল্লাহ্তালার এক সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী, ঠিক তেমনি এ ঘটনায় খোদাতাআলার ফিরিশ্তাকে পীলাতের স্ত্রীর এ ঐশী ইঙ্গিত দিতে দেখতে পাওয়া যে, মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে তা তাদের জন্য অমঙ্গলের কারণ হবে তা সত্ত্বেও মসীহ্ যদি ক্রুশে নিহত হন, তাহলে ফিরিশ্তার এই আত্মপ্রকাশ বৃথা সাব্যস্ত হয়। এটা অকল্পনীয়। দুনিয়াতে এর কি কোন নজির আছে? একটিও নেই। প্রত্যেক পুণ্যাত্মা মানুষের স্বচ্ছ বিবেক পীলাতের স্ত্রীর স্বপ্ন সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এতে নিহিত এ সাক্ষ্যকে অনুভব না করে পারে না যে, প্রকৃতপক্ষে এ স্বপ্নের এক মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, যেন হযরত মসীহ্কে উদ্ধার করার এক ভিত্তি স্থাপন করা হয়। অবশ্য দুনিয়াতে বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জের টেনে একটি প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করার ও গ্রহণ না করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু ন্যায়-বিচারের মাপকাঠিতে মানতেই হয়, পীলাতের স্ত্রীর স্বপ্নটি ক্রুশের মৃত্যু থেকে মসীহ্র রক্ষা পাওয়ার এক অতি বলিষ্ঠ সাক্ষ্য বিশেষ। আর এ সাক্ষ্যটি সবচেয়ে প্রথম স্তরের ইঞ্জিল তথা মথি লিপিবদ্ধ করেছে। এ পুস্তকে আমি জোরালোভাবে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করবো যদিও সেগুলোতে মসীহ্র ঈশ্বরত্ব ও প্রায়শ্চিত্তবাদ সহসা বাতিল হয়ে যায়, তবুও ঈমানদারী ও সত্যের প্রতি ভালবাসা সর্বদা এটাই চায়, আমরা যেন সত্য গ্রহণে গোষ্ঠী ও প্রথাগত বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করি। মানব সৃষ্টি অবধি আজও তার দৃষ্টির সংকীর্ণতা শত সহস্র বস্তুকে খোদা বানিয়ে বসেছে। এমন কি, বিড়াল ও সাপেরও পূজা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান মানুষ খোদা-প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যে এ প্রকারের পৌত্তলিকতাপূর্ণ বিশ্বাসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে।

ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের সুরক্ষার সমর্থনে ইঞ্জিলে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সেগুলোর একটি হচ্ছে কবর থেকে বার হবার পর গালীলের দিকে তাঁর দূর-দূরান্তের সফর, যে সফরে তিনি রোববার সকালে প্রথমে মরিয়ম মগ্দালীনির সাথে দেখা করেন। মরিয়ম

তৎক্ষণাৎ হাওয়ারীদের সংবাদ দেন যে, মসীহ্ জীবিত আছেন। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করলো না। তারপর হাওয়ারীদের দুজন গ্রামের দিকে যাবার পথে তাঁকে দেখতে পেলো। আর সব শেষে সেই এগারোজন আহার করতে বসলে তাঁকে দেখতে পায়। সেখানে তিনি তাদের ঈমানের দুর্বলতা ও হৃদয়ের কঠোরতার জন্য তিরষ্কার করেন। দেখুন, মার্ক ১৬ঃ৯-১৪। আর মসীহ্র শিষ্যরা যাত্রা পথে যিরূশালিম থেকে পৌনে চার মাইল দূরবর্তী ইম্মায়ুস নামক পল্লীর দিকে যখন এগোচ্ছিল তখন মসীহ্ তাদের সাথে এসে মিলিত হন। এরপর তারা সে পল্লীর কাছাকাছি পৌঁছলে মসীহ্ তাদের কাছ থেকে পৃথক হবার উদ্দেশ্যে যখন সামনে এগিয়ে যেতে চান, তখন তারা তাঁকে যেতে দিল না এবং বললো,'এ রাত আমরা একত্রে অবস্থান করবো।' এরপর তিনি তাদের সাথে বসে আহার করেন এবং মসীহ্সহ তারা সকলে ইম্মায়ুস (*Emmaus*) নামক গ্রামে রাত যাপন করেন। দেখুন, লূক ২৪ঃ১৩-৩১।

অতএব মসীহ্ তাঁর মরণোত্তর পারলৌকিক দেহের মাধ্যমে নশ্বর দেহের আচরণ-পানাহার, নিদ্রাগমন এবং যিরূশালিমের প্রায় সত্তর মাইল দূরবর্তী গালীলের দিকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন বলে যে ধারণা করা হয় তা একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক বৈ কিছু নয়। অথচ মানুষের স্বকীয় ধ্যান-ধারণার প্রবণতা অনুযায়ী ইঞ্জিলগুলোর এসব বর্ণনায় বহু পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও আক্ষরিকভাবে এখন এর যেটুকুই বিদ্যমান আছে তা থেকেও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ্ (আঃ) এ নশ্বর ও সাধারণ দেহেই তাঁর শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, গালীলের দিকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, শিষ্যদেরকে তাঁর দেহের ক্ষতগুলো দেখান এবং রাতের বেলায় তাদের সাথে খাবার খান এবং নিদ্রা যান। পরে আমি এ-ও প্রমাণ করবো, তিনি তাঁর ক্ষতগুলোর এক মলম দ্বারা চিকিৎসা করেন।

অতএব এস্থলে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এক অলৌকিক গৌরবময় ও চিরস্থায়ী দেহ পাওয়ার পর অর্থাৎ সেই অবিনশ্বর দেহ লাভের পর, যা পানাহারমুক্ত হয়ে চিরকাল খোদাতালার দক্ষিণ হস্তে উপবিষ্ট হওয়ার উপযোগী এবং সব ধরনের ক্ষত, বেদনা ও দুর্বলতা হতে পবিত্র এবং অনাদি ও অনন্ত খোদার প্রতাপে রঞ্জিত হয়েও কি তা এত ত্রুটিযুক্ত ছিল যে, এতে ক্রুশ ও

পেরেকের তাজা জখমগুলো বিদ্যমান, যা থেকে রক্ত ঝরছিল আর সেই সাথে ব্যথা ও যন্ত্রণাও ছিল এবং এর জন্য একটি মলমও প্রস্তুত করা হয়েছিল? সেই গৌরবময় ও অবিনশ্বর দেহ পাবার পরও যা চির অক্ষত, নিখুঁত, সুষ্ঠু ও অপরিবর্তনীয় হওয়া উচিত ছিল তা কত রকম দোষ-ত্রুটিতে ভরা ছিল! মসীহ্ নিজেই শিষ্যদেরকে তাঁর দেহের হাড়-মাংস দেখালেন। শুধু তাই নয়, বরং ইহলৌকিক নশ্বর মানবদেহের সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী, যেমন- ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টেও তা জর্জরিত ছিল। নইলে, গালীল সফরকালে অহেতুক পানাহার, বিশ্রাম ও নিদ্রাযাপনেরই বা তাঁর কী প্রয়োজন ছিল? নিঃসন্দেহে ইহজাগতিক নশ্বর মানবদেহের জন্যই ক্ষুধা ও পিপাসাও এমন এক কষ্ট যা সীমাতিরিক্ত হলে মানুষ মারা যেতে পারে। অতএব সন্দেহাতীতভাবে সত্য, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে মারা যান নি এবং অলৌকিক নূতন কোন গৌরবময় দেহও লাভ করেন নি, বরং তিনি এক মৃত্যুতুল্য সঙ্গাহীন অবস্থায় ছিলেন। এরপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ঘটনাক্রমে তাঁকে যে কবরটিতে রাখা হলো তা এ দেশীয় কবরের ন্যায় ছিল না বরং তা ছিল বায়ু চলাচলের উপযোগী এক জানালাবিশিষ্ট কক্ষ। সে যুগে ইহুদীদের মাঝে কবরকে হাওয়াদার ও প্রশস্ত কামরার মত করে বানাবার প্রচলন ছিল। আর এতে একটি জানালা রাখা হতো। এ ধরনের কবর আগে থেকে তৈরী (করে) রাখা হত। এবং যথা সময়ে এতে মৃতদেহ রাখা হত। সুতরাং ইঞ্জিলগুলো এর স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, যেমন লূকের ইঞ্জিলে লেখা আছেঃ

> 'তারা অর্থাৎ মহিলারা রবিবার প্রত্যুষে যে সুগন্ধি প্রস্তুত করেছিল তা নিয়ে কবরের পাশে উপস্থিত হলো। তাদের সাথে আরো ক'জন মহিলাও ছিল; তারা দেখতে পেল, কবর থেকে পাথরটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে (এ স্থলে পাঠক একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন- গ্রন্থকার) এবং কবরের ভিতরে প্রবেশ করে তারা প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেল না।' (লূক ২৪ঃ১-৩)।

এখন, 'ভিতরে প্রবেশ করা' কথাটি লক্ষণীয়। স্পষ্ট যে, মানুষ সে কবরের ভিতরেই প্রবেশ করতে পারে, যা একটি কামরার মত হবে এবং এতে জানালা থাকবে। আমি এ পুস্তকেই যথাস্থানে বর্ণনা করবো, সম্প্রতি যে

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর শ্রীনগর-কাশ্মীরে আবিষ্কৃত হয়েছে, উল্লেখিত কবরটির ন্যায় এরও একটি জানালা আছে। এ এক চমৎকার তথ্য। এ নিয়ে গবেষণা করলে এ সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীগণ সন্তোষজনকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবেন।

ইঞ্জিলের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোর মাঝে আরেকটি হলো পীলাতের সেই উক্তি, যা মার্কের ইঞ্জিলে লেখা আছে ঃ

'পরে সন্ধ্যা হ'লে সেই দিন আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের (তথা সাবাতের) পূর্বদিন বিধায়, আরিমাথিয়ার যোসেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসলেন, তিনি নিজেও খোদার রাজ্যের অপেক্ষা করতেন; তিনি সাহসপূর্বক পীলাতের নিকটে গিয়ে যীশুর দেহ যাচ্ঞা করলেন। কিন্তু যীশু (মসীহ্) যে এত শীঘ্র মারা গিয়েছেন পীলাত এতে বিস্মিত হয়ে সন্দেহ করলেন।' (মার্ক ১৫ঃ৪২-৪৪)।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে থাকার সময়টিতেই যীশুর মারা যাওয়া সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সন্দেহও এরূপ ব্যক্তি পোষণ করেন যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যেতে কতটুকু সময় নেয়।

ইঞ্জিল থেকে আমরা যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে পাই সেগুলোর একটি হ'ল এর এ উদ্ধৃতি যা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

'সেই দিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে সেই দেহগুলো যেন ক্রুশের উপরে না থাকে কেননা সেই বিশ্রামবার ছিল মহাদিন- এ নিমিত্ত ইহুদীগণ পীলাতের কাছে নিবেদন করলো, যেন তাদের পা ভেঙ্গে তাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। অতএব সেনারা এসে সেই প্রথম ব্যক্তির এবং তার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গলো, কিন্তু তারা যখন যীশুর নিকটে এসে দেখলো তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর পা ভাঙ্গলো না। কিন্তু একজন সেনা বর্শা দিয়ে তাঁর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করলো, তাতে অমনি রক্ত ও জল বের হলো।' (যোহন ১৯ঃ৩১-৩৪)।

ইঞ্জিলের এসব আয়াত থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, সে যুগে ক্রুশবিদ্ধ কোন ব্যক্তির জীবনাবসানের জন্য তাকে কয়েক দিন যাবৎ ক্রুশের উপরে রাখার পর, তার হাড়গোড় ভাঙ্গার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্র হাড় ইচ্ছাকৃতভাবেই ভাঙ্গা হয়নি এবং নিশ্চয় তাঁকে সে দুই চোরের মতই জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো হয়। সে কারণেই বর্শা তাঁর পার্শ্বদেশ ছেদ করলে রক্তও বেরিয়ে আসে। অথচ মৃত মানুষের রক্ত জমে যায়। এখানে স্পষ্টত এ -ও প্রতীয়মান হয়, এ সবই কোন গোপন পরিকল্পনা ছিল। পীলাত একজন খোদাভীরু ও সচ্চেতা ব্যক্তি ছিল। সিজারের ভয়ে সে প্রকাশ্যভাবে হযরত মসীহ্র সাহায্য করতে অপারগ ছিল। কেননা ইহুদীরা মসীহ্কে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সে মসীহ্ (আঃ)-কে চাক্ষুষভাবে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। পক্ষান্তরে সিজার এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই পীলাত কেবল দেখেই নি বরং মসীহ্র পক্ষ সমর্থনে অনেক সৌজন্যও প্রদর্শন করে। সে কখনও চায় নি, মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হোক। সুতরাং ইঞ্জিলগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে পরিষ্কার জানা যায়, পীলাত মসীহ্কে ছেড়ে দিতে কয়েকবারই সংকল্প নেয়। কিন্তু ইহুদীরা বলে ওঠে, 'তুমি যদি এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও তাহলে সাব্যস্ত হবে, তুমি সিজারের প্রতি বিশ্বস্ত নও।' তারা আরও বলে, 'এ ব্যক্তি একজন বিদ্রোহী এবং সে নিজে রাজা হতে চায়'। দেখুন, যোহন ১৯ঃ১২। কোনও উপায়ে মসীহ্কে যেন ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় সে লক্ষ্যে পীলাতের স্ত্রীর স্বপ্ন আরও কাজ করে। নইলে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু ইহুদীরা যেহেতু এক দুষ্ট প্রকৃতির দুষ্কর্মপরায়ণ জাতি ছিল এবং পীলাতের বিরুদ্ধে সিজারের নিকট গোপনে সংবাদ পৌঁছাতেও প্রস্তুত ছিল, সেহেতু পীলাত মসীহ্কে ছাড়াবার লক্ষ্যে কৌশল খাটিয়ে কাজ করে। প্রথমত মসীহ্কে ক্রুশে দেয়ার ব্যাপারটি শুক্রবারে নিয়ে যায় যখন সূর্যাস্তের মাত্র কয়েক ঘন্টাই বাকী ছিল এবং এর পরেই মহা সাবাতের রাত নেমে আসছিল। পীলাত ভালভাবেই জানতো, ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মসীহ্কে কেবল সন্ধ্যা পর্যন্তই ক্রুশে রাখতে পারবে, এরপরে কাউকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা বেআইনী হবে। সুতরাং সবকিছু ঠিকঠিক সেভাবেই ঘটে। হযরত মসীহ্কে সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই ক্রুশ থেকে নামানো হয়। আর তখন মসীহ্র সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ চোর দুটি তো জীবিত থাকলো, কিন্তু মসীহ্ কেবল দু'ঘন্টার মাঝেই মারা গেলেন- এটা সম্পূর্ণ

অচিন্তনীয় ব্যাপার। বরং কেবল মসীহ্কে হাড়গোড় ভাঙ্গার প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এসব অজুহাত তৈরী করা হয়েছিল। চোর দু'টোকে জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছিল। কেননা ক্রুশের উপর থেকে অভিযুক্ত মানুষকে জীবিতাবস্থায় নামানোই প্রচলিত নিয়ম ছিল। এরপর কেবল হাড়গোড় ভাঙ্গা হলেই তারা মারা যেতো, অথবা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর অবস্থায় কয়েক দিন ক্রুশে বিদ্ধ থাকার পর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। কিন্তু মসীহ্কে এগুলোর কোন একটিও ভোগ করতে হয় নি। তাঁকে কয়েক দিন ক্রুশের উপরে অভুক্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় রাখাও হয় নি, আর তাঁর হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ করাও হয় নি। তাঁকে মৃত বলে দেখিয়ে ইহুদীদেরকে তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন করে দেয়া হয়। কিন্তু উভয় চোরের হাড়গোড়ও বিচূর্ণ করে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু ঘটানো হয়। তাদের একজন সম্পর্কেও যদি বলা হতো, সে যেহেতু মারা গেছে, তার হাড়গোড় ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই, তবে না কথা ছিল! এ বিষয়টি একজন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বড় একটি প্রমাণ। আর পীলাতের সম্মানিত বন্ধু ইউসুফ নামক এক ব্যক্তি যিনি এতদঞ্চলের রইস (নেতা) এবং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর গোপন শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি যথাসময়ে দৃশ্যপটে এসে উপস্থিত। আমার মনে হয়, তাকেও পীলাতের ইঙ্গিতেই ডাকা হয়েছিল। মসীহ্কে মৃত বলে ঘোষণা দিয়ে শবদেহ হিসেবে তার নিকট সমর্পণ করে দেয়া হয়। সে যেহেতু একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিল, ইহুদীরা তার সাথে কোন ঝগড়া বাঁধাতে পারে নি। দৃশ্যপটে উপস্থিত হয়ে সে সঙ্গাহীন মসীহ্কে এক মৃতদেহ হিসেবে নিয়ে গেল। সেখানে কাছেই এক প্রশস্ত ঘর ছিল যা সে যুগের রীতি অনুযায়ী কবরের মত করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে এক জানালাও ছিল এবং এটি এমন এক জায়গায় অবস্থিত যা ছিল ইহুদীদের প্রভাব মুক্ত। সেই জায়গাটিতেই মসীহ্কে পীলাতের ইঙ্গিতে রাখা হয়।

এ ঘটনাটি সেই সময়ে ঘটে, যখন হযরত মূসার মৃত্যুর পর চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রম করছিল এবং ইস্রাঈলী শরীয়তকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ সেই চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ছিলেন। আর ইহুদীরা যদিও উক্ত শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্র জন্য অপেক্ষমানও ছিল এবং বিগত নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীও সে সময়টির পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছিল, কিন্তু

আক্ষেপের বিষয়, ইহুদীদের অযোগ্য মৌলবীরা সেই যথাযথ সময়টিকে সনাক্ত করলো না, আর প্রতিশ্রুত মসীহ্কে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দিল। কেবল তা-ই নয়, বরং তাঁকে কাফির আখ্যা দিয়ে 'মুলহিদ', পথভ্রষ্ট ইত্যাদি নামে অভিহিত করলো এবং পরিশেষে তাঁকে মেরে ফেলার ফত্ওয়া জারী করে তাঁকে আদালতে টেনে নিয়ে গেল। এতে বোঝা যায়, আল্লাহ্তাআলা চতুর্দশ শতাব্দীটিতে এমনই ধরনের এক প্রভাব রেখেছেন যার দরুন জাতি সে সময় কঠোর হৃদয় এবং ধর্মীয় নেতারা সংসার উপাসক, অন্ধ ও সত্যের শত্রু হয়ে যায়। এস্থলে যদি মূসার (আঃ) চতুর্দশ শতাব্দী এবং মূসার মসীল (সদৃশ) তথা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝে পরস্পর তুলনা করা হয় তাহলে প্রথমত দেখা যাবে, এ উভয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এমন দু'জন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা মসীহ্ মাওউদ হবার দাবী করেছেন এবং তাদের দাবী সত্য, তারা খোদার পক্ষ থেকে ছিলেন। আর সেই সাথে এ-ও জানা যাবে যে, জাতির আলেমরা এ উভয়কে কাফির আখ্যা দিয়েছে। এঁদের নাম রেখেছে মুলহিদ ও দাজ্জাল এবং এ উভয়ের সম্পর্কে হত্যার ফত্ওয়া লেখা হয়েছে। উভয়কে আদালতে টেনে নেয়া হয়েছে। এগুলোর মাঝে একটি ছিল রোমান আদালত এবং অপরটি ইংরেজী আদালত। পরিশেষে উভয়কে রক্ষা করা হয়েছে এবং উভয় শ্রেণীর মৌলবী তা ইহুদী হোক বা মুসলমান সবাই ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছে। খোদাতাআলা উভয় মসীহ্কে এক বড় জামাত দান করতে এবং উভয়ের শত্রুদেরকে বিফল মনোরথ করতে চেয়েছেন। মোটকথা, মূসা (আঃ)-এর চতুর্দশ শতাব্দী এবং আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা (প্রভু ও অভিভাবক) নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চতুর্দশ শতাব্দী দুটোই নিজ নিজ মসীহ্র জন্য কঠিনও এবং পরিণামে আশিসপূর্ণও।

ক্রুশের মৃত্যু থেকে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর উদ্ধার সম্পর্কে ইঞ্জিলের সাক্ষ্য প্রমাণের মাঝে মথি লিখিত ইঞ্জিলের ২৬ঃ৩৬-৪৬ শ্লোকে লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যটিও রয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে, ঐশীবাণীর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ তাঁর গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পেয়ে সারা রাত আল্লাহ্র আস্তানায় সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকেন। এভাবে সকাতরে দোয়া করার জন্য হযরত মসীহ্কে যে দীর্ঘ সময় দেয়া হয়েছিল তাঁর সে সময়কার সকরুণ

দোয়া কবুল না হয়ে পারে না। কেননা, অস্থিরতার সময়ে আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের দোয়া কখনো অগ্রাহ্য হয় না। তবু সারা রাত হযরত মসীহ্ (আঃ) ব্যথিত অন্তরে, অতি অসহায় ও মযলুম অবস্থায় যে দোয়া করলেন তা কী করে অগ্রাহ্য হলো? অথচ মসীহ্ দাবী করেন,'পিতা যিনি আকাশে আছেন তিনি আমার ডাক শোনেন।' অতএব বিপর্যস্ত অবস্থায় তাঁর সে অস্থিরচিত্তের দোয়া সম্পর্কে কী করে বলা যায় যে,আল্লাহ্‌তাআলা তা শোনেন নি? অথচ ইঞ্জিল এ-ও ঘোষণা করে যে, হযরত মসীহ্‌র অন্তরে দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, তাঁর সে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়েছে। আর সে দোয়ার ওপরে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। সে কারণেই তাঁকে যখন আটক করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তখন তিনি নিজ আশানুরূপ বাহ্যিক লক্ষণাবলী দেখতে না পেয়ে উচ্চস্বরে বলে ওঠেন, 'এলি, এলি, লিমা সাবাকতানী' - হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি কেন আমায় ছেড়ে দিলে? (মতি ২৭:৪৬) অর্থাৎ কখনও আশা করি নি আমার এ পরিমাণ হবে- আমি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাব। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তুমি আমার দোয়া শুনবে। অতএব ইঞ্জিলের উক্ত উভয় স্থলে স্পষ্টত বুঝায় যে, মসীহ্ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, নিশ্চয় তাঁর দোয়া কবুল হবে, সারা রাত কেঁদে কেঁদে করা তাঁর দোয়া বৃথা যাবে না। যেমন, তিনি নিজে তাঁর শিষ্যদেরকে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন, 'তোমরা দোয়া কর, কবুল করা হবে।' বরং তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন এক বিচারকের বৃত্তান্তও বর্ণনা করেন,যে খোদাকেও ভয় করতো না এবং মানুষকেও ভয় করতো না। এ দৃষ্টান্তটির দ্বারা তিনি শিষ্যদের এটাই বুঝিয়েছেন, তারা যেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, খোদা অবশ্যই দোয়া শোনেন ও কবুল করেন। আসন্ন এক মহা বিপদ সম্বন্ধে মসীহ্‌কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জানানো হলে তিনিও অন্যান্য ঐশী-তত্ত্বদর্শী বান্দাদের ন্যায় এ দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তিতে দোয়া করেছিলেন যে, খোদাতাআলার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই, এবং কোন বিষয় ঘটা বা না ঘটা সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারে; কিন্তু মসীহ্‌র নিজেরই দোয়া কবুল হয়নি-এমনটি ঘটলে নিশ্চয় শিষ্যদের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়তো এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো। অতএব হাওয়ারীদের ঈমান নষ্ট করে দেয়, তাদের সামনে ওরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন কী করে সম্ভব ছিল? অথচ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল, মসীহ্ সারা রাত পরম বিনয় ও আকুতির সাথে

বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দোয়া করেছিলেন। মসীহ্র মত মহান নবীর সে দোয়া (নাউযুবিল্লাহ্) কবুল না হলে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন হতো তদ্বারা তাদের ঈমান মহা পরীক্ষার কবলে পড়ে যেত। কাজেই মহাকৃপাকারী খোদা মসীহ্র সে দোয়া কবুল না করে পারেন না। নিশ্চিত স্মরণ রেখো, গেথসেমীন *(Gethsemane)* নামক স্থানে মসীহ্ যে দোয়া করেছিলেন তা অবশ্যই কবুল হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, মসীহ্ (আঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যেভাবে গোপন পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে লক্ষ্যে (ইহুদী) জাতির সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় আলেমরা 'কিয়াফা' নামক প্রধান পুরোহিতের বাড়ীতে মসীহ্র হত্যা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছিল, সেভাবে হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যেও গোপনে পরামর্শ করা হয়েছিল। আর তেমনি আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামকেও হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কার দারুন-নদওয়ায় গোপন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ উভয়কে [অর্থাৎ মূসা ও নবী করীম (সাঃ)] সেসব গোপন পরামর্শের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত মসীহ্র বিরুদ্ধে পরামর্শের ঘটনা সময়ের ব্যবধানের দিক দিয়ে অপর দুটি পরামর্শের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। কাজেই কী কারণে তাঁকে রক্ষা করা হলো না, অথচ তিনি অন্য দু'জন মহান নবীর চেয়ে অনেক বেশি দোয়া করেছিলেন? যেখানে খোদা তাঁর প্রিয় বান্দাদের দোয়া অবশ্যই শোনেন এবং দুর্বৃত্তদের গোপন পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেখান, সেখানে আবার কী কারণে হযরত মসীহ্র দোয়া শোনা হলো না?

সকল সত্যবাদী বান্দার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, অস্থির ও মযলুম অবস্থায় তাঁদের দোয়া কবুল হয়, বরং সত্যবাদী বান্দার জন্য বিপদকালই ঐশী নিদর্শন প্রকাশের সময়। সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। আমার স্মরণ আছে, পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরে বসবাসরত এক খৃষ্টান ভদ্রলোক ডঃ মার্টিন ক্লার্ক দু'বছর পূর্বে আমার বিরুদ্ধে এক হত্যা প্রচেষ্টার মিথ্যা মোকদ্দমা গুরদাসপুর জেলা আদালতে দায়ের করেন। তাতে তিনি এ নালিশ পেশ করেন, আমি নাকি আব্দুল হামীদ নামক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে উল্লেখিত ডাক্তার সাহেবকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। এ মোকদ্দমায় ঘটনাচক্রে খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান এ তিন জাতির কয়েকজন ফন্দিবাজ

ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণে এক জোট হয় এবং আমার বিরুদ্ধে সেই হত্যা প্রচেষ্টার অপবাদকে আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। খৃষ্টান পাদ্রীরা আমার প্রতি এজন্য নারাজ ছিল যে, আমি মসীহ্ (আঃ)-এর সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে খোদার বান্দাদেরকে উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট ছিলাম এবং এখনও আছি। আর এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে (আমার সাথে তাদের আচরণের) আমার দেখা প্রথম নমুনা। হিন্দুরা আমার প্রতি এজন্য রুষ্ট ছিল যে, আমি লেখরাম নামক তাদের একজন পন্ডিত সম্পর্কে তার সম্মতিক্রমে তার মৃত্যু সম্বন্ধে খোদার ইলহাম পেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, আর সে ভবিষ্যদ্বাণী এর নির্দিষ্ট মেয়াদে যথাসময়ে পূর্ণ হয়ে যায়। সেটি ছিল এক ভয়াবহ ঐশীনিদর্শন। আর তেমনি মুসলমান মৌলবীগণও নারাজ ছিলেন। কেননা আমি তাদের রক্তপাতকারী মাহ্দী ও রক্তক্ষরণকারী মসীহ্র আগমনের এবং তাদের জেহাদের মস্লার বিরোধী ছিলাম। কাজেই এ তিনটি জাতির কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরস্পর গোপন পরামর্শ করলেন যাতে আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় ও আমাকে প্রাণদন্ড বা কারাদন্ড দেয়া হয়। কিন্তু এসব চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তারা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে জালেম ছিল। আর এসব পরিকল্পনা সংগোপনে প্রণয়নকালের পূর্বেই খোদাতাআলা আমাকে তা জানিয়ে দেন এবং পরিশেষে আমাকে অভিযোগমুক্ত সাব্যস্ত করার সুসংবাদও প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত পবিত্র ঐশীবাণীসমূহ শত শত লোকের মাঝে আগে ভাগেই প্রচার করা হয়। ইলহাম যোগে সংবাদ পেয়ে যখন আমি দোয়া করি, 'হে আমার মাওলা! এ বিপদ আমার পক্ষ হতে প্রতিহত কর', তখন আমার প্রতি ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়, 'আমি প্রতিহত করবো এবং এ মোকদ্দমায় তোমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবো।' সেসব ঐশীবাণী তিন শতেরও অধিক সংখ্যক লোককে শোনানো হয়। তারা এখনও জীবিত রয়েছেন। এরপর ঘটনা হলো, আমার শত্রুরা মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করে এবং আদালতের সামনে সেসব সাক্ষী পেশ করে সে মোকদ্দমাকে প্রমাণ-সিদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। তারপর এমনটি হলো, সে মোকদ্দমা যে হাকিমের কাছে ছিল তিনি ছিলেন গুরদাসপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডাব্লিউ ডগলাস। আল্লাহ্তাআলা বিভিন্ন উপায়ে সে মোকদ্দমার প্রকৃত সত্য (ও বাস্তব তত্ত্ব-তথ্য) সে হাকিমের নিকট প্রতিভাত ও উদ্ঘাটিত করে দিলেন।

তিনি সুস্পষ্টত বুঝে গেলেন, এটা এক মিথ্যা মোকদ্দমা। তখন তিনি তাঁর সুবিচারপ্রিয়তার গুণে ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী ও চাহিদায় সেই পাদ্রী পদাধিকারী ডাক্তারের কোন খাতির না করে মোকদ্দমাটি খারিজ করে দিলেন। আর খোদাতাআলার কাছ থেকে আমি ইলহাম পেয়ে বিদ্যমান ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখেও পরিণামে আমার নির্দোষ সাব্যস্ত হবার যে সুসংবাদ সাধারণ সব সভায় ও শত শত লোকের মাঝে বর্ণনা করেছিলাম, হুবুহু তা-ই প্রকাশিত হলো, এবং তা অনেকের ঈমানের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হলো। কেবল এটাই নয়, বরং আরও বহু ধরনের মিথ্যা অপবাদ ও অপরাধমূলক অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উল্লেখিত অজুহাতের কারণে উত্থাপন করা হয়। কিন্তু আদালত থেকে আমার নামে সমন আসার পূর্বেই আল্লাহ্তাআলা আমাকে তাঁর ইলহামের মাধ্যমে সেগুলোর উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং প্রত্যেক ভয়াবহ মোকদ্দমায় আমার নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন।

আমার এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তাআলা দোয়া শ্রবণ করেন, বিশেষত তাঁর ওপর ভরসাকারীগণ নির্যাতিত অবস্থায় যখন তাঁর দোরগোড়ায় মস্তকাবনত হন তখন তিনি তাদের ফরিয়াদ শ্রবণে ও তাদেরকে উদ্ধারকল্পে এগিয়ে আসেন এবং এক অদ্ভূত ধারায় তাদেরকে সাহায্য করেন। আমি এর সাক্ষী। অতএব আবার কী কারণে হযরত মসীহ্র এত অস্থিরতা ও উদ্বেগপূর্ণ দোয়া গৃহীত হলো না? না, বরং গৃহীত হয় এবং খোদা তাঁকে উদ্ধার করেন। খোদা তাঁর রক্ষাকল্পে ভূ-পৃষ্ঠ থেকেও উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং আকাশ থেকেও সৃষ্টি করেন। ইউহান্না অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া নবীকে খোদাতাআলা দোয়া করার জন্য তেমন অবকাশ দেন নি। কেননা, তাঁর বিদায় কাল এসে গিয়েছিল। কিন্তু মসীহ্কে দোয়া করার জন্য সারা রাত অবকাশ দেয়া হয়। তিনি সমস্ত রাত সিজদায় ও কিয়ামে খোদার সামনে দন্ডায়মান থাকেন। কেননা খোদা চান, মসীহ্র পক্ষ থেকে উদ্বেগী অস্থিরতা প্রকাশিত হোক, আর সেই খোদার নিকট সে নিষ্কৃতি কামনা করুক, যাঁর পক্ষে অসাধ্য বলে কিছু নেই। অতএব খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী তার দোয়া শ্রবণ করেন। তাকে ক্রুশে দিয়ে ইহুদীরা যে

বিদ্রুপ করেছিল, 'সে (মসীহ) খোদার ওপর ভরসা করেছিল, খোদা কেন তাকে পরিত্যাগ করলেন?'-এতে ওরা নির্ঘাৎ মিথ্যেবাদী ছিল। কেননা, খোদাতাআলা ইহুদীদের সমস্ত পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেন এবং তাঁর প্রিয় মসীহ্কে ক্রুশ ও এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করেন। ইহুদীরা বিফল মনোরথ হয়।

ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে মসীহ্ (আঃ)-এর উদ্ধার প্রাপ্তি সম্পর্কে ইঞ্জিলের সাক্ষ্য প্রমাণের মাঝে মথি লিখিত ইঞ্জিলের সে শ্লোকটিও রয়েছে যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

> 'ধার্মিক হাবিলের রক্তপাত অবধি, বরখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে (যাকারিয়া) তোমরা মন্দির ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করেছিলে তার রক্তপাত পর্যন্ত- আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি, একালের লোকদের ওপরে এ সমস্তই বর্তাবে।'(মথি ২৩ঃ৩৫-৩৬)।

এ শ্লোক দুটিতে গভীর মনোনিবেশে স্পষ্টত প্রতীয়মান হবে যে, হযরত মসীহ্ এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, ইহুদীরা যতজন নবীকে হত্যা করেছে তাদের এ জাতীয় কার্যকলাপের ধারা যাকারিয়া নবী পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। এরপর ইহুদীরা আর কোন নবীকেই হত্যা করতে সক্ষম হবে না। এটা এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী। এথেকে সুস্পষ্টত নির্ণিত হয়, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশের মাধ্যমে যাকারিয়ার ন্যায় নিহত হননি, বরং ক্রুশ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। কেননা এটাই যদি সত্য হতো যে মসীহ্ও ইহুদীদের হাতে নিহত হবেন, তাহলে এ শ্লোকগুলোতে নিশ্চয় তিনি তাঁর নিহত হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত করতেন। যদি বলেন, হযরত মসীহ্ ইহুদীদের হাতে নিহত হলেও তাঁকে মেরে ফেলাতে ইহুদীদের কোন পাপ হয় নি। কেননা, তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিহত হন, তবে এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, যোহন লিখিত ইঞ্জিলে ১৯ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে হযরত মসীহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইহুদীরা মসীহ্কে হত্যা করার সংকল্পের দরুন বড্ড পাপী। এমনি ধারায় আরও কয়েক জায়গায় এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর স্পষ্টভাষায় লেখা আছে, মসীহ্র বিরুদ্ধে যে অপরাধে তারা অপরাধী হয়েছে এর প্রতিফল হিসেবে তারা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে

শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল। দেখুন, মথি ২৬ঃ২৪।

ক্রুশের মৃত্যু থেকে হযরত মসীহ্র উদ্ধারপ্রাপ্তি সম্পর্কে ইঞ্জিলের সাক্ষ্য-প্রমাণের মাঝে মথির ইঞ্জিলের বিদ্যমান ভাষ্যটি নিম্নরূপ ঃ

'আমি তোমাদেরকে সত্যসত্য বলছি, যারা এখানে দাঁড়ানো রয়েছে তাদের মাঝে এমন কয়েকজন আছে যারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্য-পুত্রকে তার রাজ্যে আসতে না দেখবে।' (মথি ১৬ঃ২৮)।

তেমনি যোহন লিখিত ইঞ্জিলে রয়েছে ঃ

'যীশু তাকে বললেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, আমার আসা পর্যন্ত সে (শিষ্য ইউহান্না তথা যোহন) এখানেই (অর্থাৎ জেরুশালেমেই) থাকবে।' (যোহন ২১ঃ২২)।

অর্থাৎ আমি চাইলে, আমার ফেরৎ আসা পর্যন্ত যোহন বেঁচে থাকবে। এ শ্লোকগুলোতে সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ ওয়াদা করেছিলেন, তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের কয়েকজন জীবিত থাকবে। আর এ জীবিত থাকা লোকদের মাঝে ইউহান্না (যোহন)-এর কথাও বলেছিলেন। অতএব এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। সুতরাং খৃষ্টানরা মেনে নিয়েছেন, সমসাময়িক লোকদের কয়েকজন জীবিত থাকতে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকল্পে যীশুর আগমন অত্যাবশ্যক ছিল, যাতে ওয়াদানুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। এ কারণেই পাদ্রী সাহেবান এ কথা স্বীকার করেন যে, যীশু তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী জেরুশালেমের বিধ্বস্ত হওয়ার সময়ে এসেছিলেন। ইউহান্না তাঁকে তখন দেখেছিল। কেননা, সে তখনও জীবিত ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, হযরত মসীহ্ সে সময় সত্যি সত্যি তাঁর নির্ধারিত চিহ্নাবলী অনুযায়ী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন না। বরং তারা বলেন, যোহনকে তিনি কাশ্ফীভাবে (দিব্য-দর্শনে) দেখা দেন। যাতে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করেন, যা মথির ১৬ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে লেখা আছে। কিন্তু আমি বলছি, এভাবে (দিব্য-দর্শনে) আসাতে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে পারে না। এটা তো অতি দুর্বল এক ব্যাখ্যা। সমালোচকদের কাছ থেকে গা বাঁচাবার

কৌশল ও একটা কষ্টকল্পিত অর্থ মাত্র। এ ব্যাখ্যাটি এত ভ্রান্ত ও প্রকাশ্য ভুল যা খন্ডন করার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, স্বপ্ন বা কাশ্ফ-এর মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ যদি মসীহ্র উদ্দেশ্য হতো তাহলে তো এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হাস্যকর এক বিষয় হয়ে দাঁড়ায় *। এভাবে তো এরও এক দীর্ঘকাল পূর্বে হযরত মসীহ্ পৌলের নিকটও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মনে হয়, মথি ১৬ অধ্যায় ২৮ শ্লোকে লিখিত এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পাদ্রী সাহেবানকে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে আর তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। কেননা, এমনটি বলা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল যে, মসীহ্ জেরুশালেমের ধ্বংস হওয়ার সময় নিজ প্রতাপের সাথে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আর আকাশে চতুর্দিকে বিদ্যুৎ চমকালে যেমন তা সবাই দেখতে পায় তেমনি সবাই তাঁকে দেখেছিল। ইঞ্জিলের এ বাক্যটিও উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল না ঃ 'যারা এখানে দাঁড়ানো রয়েছে তাদের মাঝে এমন কয়েকজন আছে যারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে তার রাজ্যে আসতে না দেখবে' কাজেই অতি কষ্টকল্পিত কৃত্রিম উপায়ে এ ভবিষ্যদ্বাণীকে (অর্থাৎ এর পূর্ণতাকে) দিব্য-দর্শন রূপে ধরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা সত্য নয়। কাশ্ফীভাবে তো সবসময় খোদার মনোনীত বান্দারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। কাশ্ফীভাবে দেখার ক্ষেত্রে স্বপ্নেরও শর্ত নেই। বরং জাগ্রত অবস্থায়ই দেখা যায়। সুতরাং আমি নিজে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। আমি কয়েকবার কাশ্ফীভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ)-কে দেখেছি এবং আরও কজন নবীর সাথেও জাগ্রত অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছি এবং সৈয়্যদ ও মাওলা নিজ ইমাম নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকেও সম্পূর্ণ

** টীকা ঃ আমি কোন কোন কিতাবে দেখেছি, এ যুগের মৌলবীরা খৃষ্টানদের চেয়েও বেশি মথি ১৬ঃ২৮-এর কষ্টকল্পিত অর্থ করে থাকেন। তারা বলেন, মসীহ্ যেহেতু নিজ আগমনের ক্ষেত্রে এ শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তখনও জীবিত থাকবে এবং ন্যূনকল্পে একজন হাওয়ারী অবশ্যই জীবিত থাকবেন, সেহেতু এ ক্ষেত্রে সে হাওয়ারীরও জীবিত থাকা আবশ্যক। কেননা, মসীহ্ এখনও ফেরৎ) আসেন নি। তাই তারা মনে করেন, সে হাওয়ারী কোন পাহাড়ে গোপনীয়ভাবে মসীহ্র অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে আছেন।- গ্রন্থকার*

জাগ্রত অবস্থায় অবলোকন করেছি, তাঁর সাথে কথা বলেছি। আর এমন স্বচ্ছ জাগ্রতাবস্থায় দেখেছি যাতে ঘুম বা তন্দ্রার নাম নিশানাও ছিল না। আমি আরও ক'জন পরলোকগত ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁদের কবরে অথবা অন্য কোন উপলক্ষ্যে সম্পূর্ণ জাগ্রত ও সচেতন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছি ও তাঁদের সাথে কথাও বলেছি। আমি ভালভাবে জানি, এ ধারায় জাগ্রত অবস্থায় বিগত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কেবল সাক্ষাতই নয়, বরং কথা-বার্তা ও করমর্দনও হয়েছে। এই জাগ্রত অবস্থা ও নিত্যকার জাগ্রত অবস্থার মাঝে পঞ্চেন্দ্রীয়ের সহজাত গুণাগুণেও কোন পার্থক্য ঘটে না। দেখতে পাই, অবিকল এ জগতেই আছি, এবং চোখ, কান ও জিহ্বা এ সবই যা আছে, অবিকল তা-ই রয়েছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে বুঝা যায়, সে এক ভিন্ন জগত। দুনিয়া এ প্রকারের জাগরণ সম্বন্ধে অবহিত নয়। কেননা, দুনিয়া উদাসীনতার জীবনে পড়ে আছে। এ জাগরণ উর্দ্ধলোক থেকে লাভ হয়। আর তাঁদেরকেই দান করা হয় যাঁরা নতুন সব ইন্দ্রীয়ে বিভূষিত হন। নিঃসন্দেহে এটা এক সঠিক তত্ত্ব; বাস্তব সত্য। অতএব ইউহান্না যদি জেরুশালেম বিধ্বস্ত হওয়ার সময় হযরত মসীহ্কে এভাবেই প্রত্যক্ষ করে থাকে, তাহলে যদিওবা জাগ্রতভাবে তাঁর সাথে কথোপকথন ও করমর্দনও করে থাকে, তবুও উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে এ ঘটনার মোটেও কোন সম্পর্ক নেই। বরং এসব বিষয় (দিব্য-দর্শনরূপে) সবসময়ই দুনিয়াতে দৃশ্যমান হয়ে থাকে। যেমন, এখনও আমি আল্লাহ্তালার অনুগ্রহে সবিশেষ মনোনিবেশে হযরত মসীহ্কে অথবা অন্য কোনো পবিত্র নবীকে পূর্ণ জাগ্রতবস্থায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু এ ধরনের সাক্ষাতে মথি ১৬ঃ২৮ বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী কখনও পূর্ণ হতে পারে না।

অতএব প্রকৃত সত্য হলো, মসীহ্ যেহেতু জানতেন, তিনি ক্রুশ থেকে রক্ষা পেয়ে অন্য দেশে চলে যাবেন এবং যতক্ষণ তিনি ইহুদীদের ধ্বংস নিজ চোখে না দেখে নেন ততক্ষণ দুনিয়া থেকেও খোদা তাকে তুলে নিবেন না, এবং যতক্ষণ মনোনীত বান্দাদের ন্যায় তাঁর জন্যও আসমানে নির্ধারিত রাজত্ব নিজ ফলাফল দেখিয়ে না দেয়, ততক্ষণ তিনি মারাও যাবেন না, সেহেতু হযরত মসীহ্ তাঁর শিষ্যদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, অচিরেই তারা তাঁর এ নিদর্শন দেখতে পাবে, যারা তাঁর ওপর তলোয়ার তুলেছে তাদেরকে তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর সম্মুখে তলোয়ার দ্বারাই

হত্যা করা হবে। অতএব কোন বিষয়ের প্রমাণ যদি আবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে খৃষ্টানদের জন্য এর চেয়ে অধিকতর প্রমাণ অন্য কিছু নেই যে, মসীহ্ নিজ মুখে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'তোমাদের কেউ কেউ জীবিত থাকতেই আমি আবার আসবো।'

মনে রাখা আবশ্যক, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্র আগমন সম্পর্কে দু'ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ঃ

(এক) শেষ যুগে তাঁর আগমনের যে ওয়াদা তা হচ্ছে রূহানীভাবে আগমনের ওয়াদা। এ আগমন সে প্রকারেরই আগমন, যে প্রকারে এলীয় (ইলিয়াস) নবী মসীহ্র সময়ে পুনরায় এসেছিলেন। সুতরাং তিনি (মসীহ্) আমাদের এ যুগে এলীয়র ন্যায় আবির্ভূত হয়েছেন। আর এ লেখকই হলো সেই মসীহ্- মানবজাতির খাদিম (সেবক), যে মসীহ্ আলায়হিস্ সালামের নামে 'মসীহ্ মাওউদ' (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্) হয়ে এসেছে। হযরত মসীহ্ আমার সম্পর্কে ইঞ্জিলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব ধন্য সেই ব্যক্তি, যে মসীহ্ (আঃ)- কে সম্মান দেয়ার জন্য আমার সম্বন্ধে সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং পদস্খলিত না হয়।

(দুই) মসীহ্র পুনরায় আগমন সম্পর্কে ইঞ্জিলে দ্বিতীয় প্রকারের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে মসীহ্র সেই জীবন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যা মসীহ্র ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর খোদাতাআলার অনুগ্রহে কায়েম ও বহাল থাকে এবং ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে খোদা নিজ মনোনীত বান্দাকে রক্ষা করেন। যেমন, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি যা এখনই বর্ণনা করা হলো। খৃষ্টানদের এটা ভুল, তারা এ দু'টি পৃথক প্রসঙ্গকে একটির সাথে আরেকটি মিলিয়ে ফেলেন। আর এ কারণেই তারা বড়ই বিভ্রাট ও নানা সংকটের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। মোটকথা, মথির ১৬ অধ্যায়ের এ শ্লোকটি হযরত মসীহ্র ক্রুশের মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়ার স্বপক্ষে বড় একটি প্রমাণ।

ইঞ্জিলে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সেগুলোর আরেকটি হলো মথির নিম্নরূপ শ্লোক ঃ

'আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাবে। আর তখন পৃথিবীর

সকল জাতি বিলাপ করবে এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘ রথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসতে দেখবে' (মথি ২৪ঃ৩০)।

এ শ্লোকগুলোর প্রকৃত মর্ম হলো, হযরত ঈসা (আঃ) বলছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন আকাশ থেকে অর্থাৎ নিছক খোদার কুদরত ও পরাক্রমে এমন সব জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষী-সাবুদ উদ্ভাবিত হয়ে যাবে, যা মসীহ্র ঈশ্বরত্ব বা ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও অকাশে গমন এবং পুনরাগমন সংক্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করে দেবে। আর যে সব জাতি তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করতো না, বরং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়ার কারণে অভিশপ্ত মনে করতো, যেমন ইহুদীরা- তাদের মিথ্যার বিরুদ্ধেও আকাশ সাক্ষ্য দেবে। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন নি, কাজেই অভিশপ্তও হন নি এ প্রকৃত সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর সে-সব জাতি ও গোষ্ঠী যারা তাঁর মর্যাদা মুল্যায়ণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা এর অবমূল্যায়ন করেছিল তারা সবাই বিলাপ করবে ও নিজেদের ভুলের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। আর সে যুগেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হলে মানুষ রূহানীভাবে মসীহ্কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে দেখবে অর্থাৎ সে সময়েই 'মসীহ্ মাওউদ' হযরত ঈসার শক্তি ও স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আবির্ভূত হবেন আর স্বর্গীয় সাহায্য সমর্থনে ও ঐশী পরাক্রম ও মহা প্রতাপে অভিষিক্ত হয়ে নিজ সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণসহ প্রকাশিত হবেন এবং মানুষ তাঁকে চিনতে ও জানতে পারবে। এ শ্লোকের ব্যাখ্যা হলো, খোদাতাআলার নিয়তির বিধানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তা এমনই ছাঁচে তৈরী হয়েছে এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলীও এমন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে যে, কোন কোন জাতি তাঁর সম্পর্কে মর্যাদা নির্ণয়ে অতিরঞ্জন করেছে আর কোন কোন জাতি তাঁর মর্যাদার অবমূল্যায়নের পথ অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ একটি হলো সেই জাতি, যারা তাঁকে মানব শ্রেণীর উর্দ্ধে নিয়ে গেছে। এমন কি, তারা বলে, এখনও তিনি মারা যান নি এবং আকাশে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে সেই জাতি, যারা বলে, ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান; তারপর আবার জীবিত হয়ে আকাশে চলে যান এবং ঈশ্বরত্বের সকল ক্ষমতা তিনি পেয়ে গেছেন, বরং তিনি স্বয়ং খোদা। অন্য জাতি হলো ইহুদী। তারা বলে, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ কারণে নাউযুবিল্লাহ্ তিনি চিরস্থায়ীভাবে অভিশপ্ত

ও ঐশীক্রোধগ্রস্ত হন- খোদা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্টি ও শত্রুতার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেন। তিনি মিথ্যাবাদী, মিথ্যারোপকারী এবং নাউযুবিল্লাহ্ কাফির ও মুলহিদ। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি নয়। অতএব মর্যাদার এ অতিরঞ্জন ও অবমূল্যায়ন ছিল অন্যায়-অবিচারপূর্ণ এমন পন্থা, যদ্দরুন খোদাতাআলার পক্ষে তাঁর সত্য নবীকে এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত করা আবশ্যক ছিল। কাজেই এ কথার দিকেই ইঞ্জিলের এ আয়াতের ইঙ্গিত রয়েছে। আর 'পৃথিবীর সকল জাতি ও গোষ্ঠী বিলাপ করবে' - এর দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেসব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ হতে পারে তারা সেদিন বিলাপ করবে আর তাদের বিলাপ খুব কঠিন হবে। এক্ষেত্রে খৃষ্টানদের একটু গভীর মনোনিবেশে এ শ্লোকটি পড়া ও চিন্তা করা উচিত, এতে যেহেতু সকল জাতি ও গোষ্ঠীর বিলাপ করা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেহেতু খৃষ্টান জাতি কী করে এ বিলাপের আওতার বাইরে থাকতে পারে? তারা কি জাতি নয়? আর তারাও যখন এ আয়াত অনুযায়ী বিলাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তখন তারা আবার কেন নিজেদের পরিত্রাণের বিষয়ে চিন্তা করেন না? এ আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মসীহ্র নিদর্শন যখন আকাশে প্রকাশিত হতে দেখা যাবে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের সকল জাতি বিলাপ করবে। অতএব যে ব্যক্তি বলে, 'আমাদের জাতি বিলাপ করবে না' সে বস্তুত হযরত মসীহ্কে প্রত্যাখ্যান করে। তবে সেসব লোকের ক্ষেত্রে বিলাপ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য হতে পারে না, যাদের জামাত এখনও স্বল্প সংখ্যক এবং জাতি বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। আর এটি হচ্ছে আমাদের জামাত। বরং কেবল এ জামাতই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব ও প্রয়োগের বাইরে। কেননা, এ জামাতের লোকসংখ্যা এখনও মাত্র স্বল্প বিধায় তাদের ওপর 'জাতি' শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। হযরত মসীহ্ খোদার পক্ষ থেকে ওহী পেয়ে জানিয়েছিলেন, আকাশে নিদর্শন প্রকাশিত হলে পৃথিবীর সমুদয় দল যারা বিপুল সংখ্যক হওয়ার দরুন 'জাতি' বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, তারা বিলাপ করবে। তাদের কেউ বাদ পড়বে না, কেবল সেই অল্প সংখ্যক লোকের জামাত ছাড়া যাদের ওপর 'জাতি' শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। খৃষ্টানরাও এ ভবিষ্যদ্বাণীর আওতার বাইরে থাকতে পারে না, এ যুগের মুসলমানও না, ইহুদীও না আর অন্য কোন প্রত্যাখ্যানকারীও এ ভবিষ্যদ্বাণীর

আওতার বাইরে থাকতে পারবে না। কেবল আমাদের জামাতই এর বাইরে আছে। কেননা, আল্লাহ্ তাদেরকে এখন মাত্র বীজস্বরূপ বপন করেছেন। নবীর বাণী কখনও কোনোভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না। এ বাণীটিতে যেহেতু পরিষ্কার এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতি বিলাপ করবে, কাজেই এ সকল জাতির মাঝে কোনটিই বা এর বাইরে থাকতে পারে? মসীহ্ তো এ শ্লোকে কোন জাতিকে বাদ দেন নি। তবে এমন জামাত অবশ্য বাদ যাবে যারা এখনও জাতির পর্যায়ে উপনীত হয় নি, যেমন আমাদের জামাত। বস্তুত এ ভবিষ্যদ্বাণী এ যুগে অতি স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহ্ সম্পর্কে যে সত্য এখন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এ সমুদয় জাতির বিলাপের কারণ। কেননা, এর দ্বারা এদের সকলের ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব নিয়ে খৃষ্টানদের হইচই হা-হুতাশে পরিণত হয়। মসীহ্ জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠে গেছেন বলে দিন-রাত মুসলমানদের হঠকারিতা ক্রন্দন ও বিলাপের রূপ ধারণ করে যায়। আর ইহুদীদের তো কিছুই আর থাকে না।

এ স্থলে এ-ও বলে দেয়া আবশ্যক, ইঞ্জিলের উল্লেখিত আয়াতে যে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'তখন পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী বিলাপ করবে' এ বাক্যটিতে 'পৃথিবী' বলতে সিরিয়ার এলাকাকে বোঝায়, যে এলাকার সাথে এ তিন জাতি সম্পর্কযুক্ত। ইহুদীরা এ কারণে যে, এখানেই তাদের সূচনা ও উৎসমূল আর এখানেই রয়েছে তাদের উপাসনালয়। খৃষ্টানরা এ কারণে যে, হযরত মসীহ্ এখানেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী প্রথম জাতির এ দেশেই উদ্ভব হয়েছে। মুসলমানরা এ কারণে যে, তারাই কিয়ামতকালে অবধি এ দেশের (প্রকৃত) উত্তরাধিকারী। তবে 'পৃথিবী' শব্দের দ্বারা গোটা পৃথিবীকে ধরা হলেও কিছু যায় আসে না। কেননা প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে প্রত্যেক প্রত্যাখ্যানকারীই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

ইঞ্জিলে যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা দেখতে পাই, মথি লিখিত ইঞ্জিলের এ শ্লোকটিও এর অন্তর্ভুক্ত ঃ

'এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; এবং তাঁর (অর্থাৎ মসীহ্‌র) পুনরুত্থানের পর

তারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।' (মথি ২৭ঃ৫২)।

মসীহ্র পুনরুত্থানের পর অনেক পবিত্র লোক কবর হতে বেরিয়ে আসলেন এবং জীবিত হয়ে তারা অনেক লোককে দেখা দিলেন- ইঞ্জিলে বর্ণিত এ বৃত্তান্তটি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক কোন ঘটনার বর্ণনা নয়। কেননা এমনটি ঘটে থাকলে এ দুনিয়াতেই কিয়ামতের ঘটনা দৃশ্যমান হয়ে যেতো, আর মানুষের ঈমান ও নিষ্ঠা নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে যে বিষয়টি দুনিয়াবাসীর জন্য গোপন রাখা হয়েছিল তা সবার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়তো। ফলে ঈমান আর ঈমান থাকতো না এবং প্রত্যেক মুমিন ও কাফিরের দৃষ্টিতে পরকালের স্বরূপ এমনই স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়ে পরিণত হতো, যেমন চাঁদ, সূর্য, দিন ও রাতের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট বিষয়। তখন ঈমান আর এমন মূল্যবান ও সমাদরযোগ্য বস্তু হতো না যার ভিত্তিতে পুরস্কার লাভের কোন আশা থাকতে পারে। লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় পবিত্র লোক ও বনী ইস্রাঈলের নবীরা যদি ক্রুশীয় ঘটনার সময়ে সত্যিসত্যি পুনর্জীবিত হতেন ও জীবিত হয়ে নগরে প্রবেশ করতেন এবং বাস্তবত মসীহ্র সত্যতা ও ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শত শত নবী ও লক্ষ লক্ষ পবিত্র লোককে পুনর্জীবিত করে এহেন অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হতো, তাহলে তদবস্থায় প্রতীয়মান হয় ইহুদীরা সেই পুনর্জীবিত নবী, পবিত্রলোক ও নিজেদের পরলোকগত পিতৃপুরুষদের কাছে মসীহ্ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল, 'ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী খোদা হবার দাবীদার এ ব্যক্তি (অর্থাৎ মসীহ্) কি প্রকৃতপক্ষেই খোদা, না কি সে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী'। যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায়, এ সুযোগটিকে তারা হাত ছাড়া হতে দেয় নি, বরং নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করে থাকবে' এ ব্যক্তিটি কেমন?' কেননা ইহুদীরা এসব বিষয়ে খুবই কৌতুহলী ও আকাঙ্খী ছিল, মৃতরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এলে যেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারে। কাজেই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় মৃতরা যখন শহরে প্রবেশ করলো এবং প্রত্যেক মহল্লায়ও ঢুকে গেল, তখন এমন সুযোগকে ইহুদীরা কী করে ছেড়ে দিতো? নিশ্চয় তারা দুই এক জনকেই নয়, বরং সেই হাজার হাজার এ পুনর্জীবিত লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে থাকবে। আর এ

মৃতরা তাদের বাড়ীঘরেও প্রবেশ করলে এই লক্ষ লক্ষ লোকের পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসায় ঘরে ঘরে হই-চই পড়ে গিয়ে থাকবে। ঘরে ঘরে কেবল এ নিয়েই আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। তারা মৃতদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকবে, 'যীশু মসীহ্ নামে লোকটিকে আপনারা কি প্রকৃতপক্ষেই খোদা বলেই জানেন?' কিন্তু মৃতদের সেই সাক্ষাতের পর যেমন কিনা আশা ছিল, ইহুদীরা হযরত মসীহ্র প্রতি ঈমান আনবে কিন্তু তারা ঈমান আনে নি, তাদের হৃদয়ও নরম হয়নি। বরং তারা আরও কঠোর-হৃদয় হয়ে যায়। এতে প্রতীয়মান হয়, খুব সম্ভব মৃতরা কোন ভাল সাক্ষ্য দেয় নি। বরং তৎক্ষণাৎ এ উত্তরই দিয়ে থাকবে, 'এ ব্যক্তি তার ঈশ্বরত্বের দাবীতে নির্ঘাৎ মিথ্যেবাদী। খোদার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে।'

এ কারণেই তো লক্ষ লক্ষ (সাধারণ) মানুষই নয় বরং নবী-রসূলের পুনর্জীবিত হয়ে আসার পরও ইহুদীরা তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত হয় নি এবং হযরত মসীহ্কে (তাদের ধারণা অনুযায়ী ক্রুশে দিয়ে) মেরে ফেলে, আবার অন্যান্যদেরকে হত্যা করতে চেষ্টিত হয়। এ কি বিশ্বাস করা যায় যে, হযরত আদম থেকে হযরত ইয়াহিয়া পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ সত্যপরায়ণ লোক সেই পবিত্র ভূমির কবরগুলোতে নিদ্রাগত ছিলেন তারা সবাই জীবিত হয়ে ওঠেন? এরপর উপদেশ দানের জন্য নগরে প্রবেশ করেন ও তাদের প্রত্যেকে হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন ঃ 'আমরা দেখে এসেছি যীশু মসীহ্ প্রকৃত পক্ষেই খোদার পুত্র, বরং তিনি স্বয়ং খোদা, তাই সবার উচিত তার উপাসনা করা ও তার সম্পর্কে তোমাদের পূর্বের ধ্যান-ধারণা পরিহার করা। নইলে তোমাদেরকে নরকে যেতে হবে।' আর লক্ষ লক্ষ মৃত সৎ ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত এ উচ্চ পর্যায়ের ও চাক্ষুষ সাক্ষ্য পেয়েও ইহুদীরা যে নিজেদের অস্বীকার থেকে বিরত হয় নি, এটা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কখনও মেনে নিতে পারে না। অতএব প্রকৃতপক্ষেই লক্ষ লক্ষ পরলোকগত সত্যবাদী, নবী-রসূল ইত্যাদি পুনর্জীবিত হয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য যদি নগরে এসে থাকতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁরা বিপরীত (তথা নেতিবাচক) সাক্ষ্যই দিয়ে থাকবেন। তারা কখনও হযরত মসীহ্র খোদা হওয়ার সত্যায়ন করেন নি। আর করেন নি বলেই ইহুদীরা মৃতদের সাক্ষ্য শুনে নিজেদের অস্বীকারে পাকাপোক্ত হয়ে

যায়। আর (খৃষ্টানদের মতে) হযরত মসীহ্ তো তাদেরকে তাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেই সাক্ষ্য শোনার পর তাঁকে নবী হিসেবে মানতেও অস্বীকার করে বসে!

মোট কথা, লক্ষ লক্ষ সেই মৃতব্যক্তিকে বা এর পূর্বেও কোন মৃতকে হযরত মসীহ্ জীবিত করেছিলেন বলে যদি বিশ্বাস করা হয় তাহলে এহেন ধর্মবিশ্বাস এক অতি ক্ষতিকর ও কুপ্রভাব বিস্তারকারী বিশ্বাস বটে। কেননা মৃত ব্যক্তিদের এ পুনর্জীবন কোন সুফল বয়ে আনে নি। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যদি দূরদূরান্তের কোন দেশে যায় আর কয়েক বছর পর স্বদেশে ফিরে আসে, তাহলে স্বভাবতই সে সেখানকার দুর্লভ জিনিস ও অদ্ভুত অভিনব বিষয়াদি মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবং তাদেরকে সে দেশের অতি বিস্ময়কর অবস্থা ও ঘটনাবলী জানাতে দারুনভাবে উৎসুক হয়ে থাকে। অনেক দিনের অনুপস্থিতির পর নিজ লোকদের সাথে আবার দেখা হলে কেউ কখনও মুখ বন্ধ করে বোবার ন্যায় বসে থাকে না। বরং সে সময় অন্যান্য মানুষও স্বভাবত উৎসুক হয়ে তার কাছে ছুটে আসে এবং সে দেশের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আবার ঘটনাক্রমে এ লোকদের কাছে যদি কোন দরিদ্র-হীন-নিঃস্ব ব্যক্তি এদিক দিয়ে যেতে গিয়ে দাবী করে যে, সে সেই দেশের রাজা, যে দেশটির রাজধানী এদের লোক ঘুরে ফিরে দেখে এসেছে; শুধু রাজাই নয়, বরং সে নিজ রাজকীয় মর্যাদায় বিভিন্ন রাজার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে যদি পরিচয় দেয়, তাহলে মানুষ সে দেশ ভ্রমণ করে আসা ব্যক্তিদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, 'বলুন তো, সম্প্রতি আমাদের দেশে সে দেশ থেকে আসা লোকটি কি সত্যি সত্যি সে দেশের রাজা?' আর এক্ষেত্রে যা প্রকৃত ঘটনা, তারা তা বলে দেবে। অতএব ইতিপূর্বে যেভাবে আমি বলে এসেছি, হযরত মসীহ্র হাতে মৃতদের জীবিত হওয়া কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারতো যখন তাদের কাছে স্বভাবত জিজ্ঞাসিত বিষয়ে তাদের সাক্ষ্যদানের অবশ্যই কোন ইতিবাচক ফল হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তদ্রূপ হয় নি। কাজেই মৃত মানুষ পুনর্জীবিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করলে, সেই সাথে অনিবার্যত এ-ও বিশ্বাস করতে হয় যে, সেসব মৃত (তথা পুনর্জীবিত) ব্যক্তি হযরত মসীহ্র অনুকূলে এমন কোন সাক্ষ্য দেয় নি, যাতে তাঁর সত্যতা মেনে নেয়া যেতো। বরং তারা এমন সাক্ষ্যই দিয়ে থাকবে যার ফলে ফেৎনা আরও বেড়ে যায়। হায়!

মানুষের পরিবর্তে যদি অন্য কোন জীব-জন্তুকে পুনর্জীবিত করার কথা বলা হতো তাহলে এতে অনেকটাই সাফাই গাওয়ার সুবিধে হতো। যেমন বলা হতো, 'হযরত মসীহ্ কয়েক হাজার ষাঁড় জীবিত করেছিলেন', তবে এ কথা অনেকটা যুক্তিসঙ্গত হতো। আর এক্ষেত্রে কারও পক্ষ থেকে এ আপত্তি উত্থাপন করা হলে, 'এ মৃতদের সাক্ষ্যের কী ফল হলো?' আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারতাম, 'এগুলো তো ষাঁড় ছিল। পক্ষে বা বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য দেয়ার মত কি এদের বাকশক্তি ছিল? তবে ভাল কথা, যেহেতু হযরত মসীহ্ যে মৃতদের জীবিত করেছিলেন তারা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। কাজেই আজ উদাহরণস্বরূপ, কয়েকজন হিন্দুকে যদি ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনাদের পরলোকগত পিতৃ-পুরুষদের দশ বিশ জন যদি জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন ও সাক্ষ্য দেন যে, অমুক ধর্মটি সত্য, তবুও কি সে ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের মনে সন্দেহ থেকে যাবে? তাহলে সে হিন্দুরা কখনও না-সূচক উত্তর দিবেন না। কাজেই সুনিশ্চিৎ বুঝে নিন, এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, এ ধরনের সত্য উন্মোচনের পরও নিজ কুফরী ও অস্বীকারে বদ্ধপরিকর ও হঠকারী হয়ে থাকে। আফসোস! এ ধরনের কল্প-কাহিনী রচনায় আমাদের দেশের শিখরা বরং খৃষ্টানদের চেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছেন। তারা এরূপ কাহিনী বানাবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হুশিয়ারীর পরিচয় দিয়েছেন। কেননা তারা বর্ণনা করেন, তাদের গুরু বাবা নানক একবার একটা হাতী জীবিত করেছিলেন। সুতরাং এটা এমন ধরনের এক অলৌকিক ক্রিয়া বটে, যে ক্ষেত্রে উল্লেখিত পরিণামজনিত আপত্তি ওঠে না। কেননা শিখগণ বলতে পারেন, 'হাতী কি কথা বলতে পারে? অতএব কী করে সে বাবা নানকের সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যানে সাক্ষ্য দিতো?' মোট কথা, জনসাধারণ তো তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে এ জাতীয় অলৌকিক ক্রিয়া নিয়ে খুবই উল্লসিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের আপত্তি ও সমালোচনার শিকার হয়ে বিব্রতবোধ করে থাকেন। যে বৈঠক বা আসরে এ সব বেহুদা কল্পকাহিনী তুলে ধরা হয় সেখানে তারা খুবই লজ্জিত হন। অবশ্য, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর সাথে আমি যেহেতু সেরূপ ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখি যেরূপ খৃষ্টানদের সম্পর্ক রয়েছে। বরং তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অধিক গাঢ়। কেননা খৃষ্টানরা জানেন না তারা কার প্রশংসা করেন। কিন্তু আমি যাঁর প্রশংসা করি তাঁকে আমি জানি, কেননা আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব

এখন আমি ক্রুশীয় ঘটনার সময়ে পরলোকগত সব পুণ্যবান ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন বলে ইঞ্জিলে লেখা বিশ্বাসটির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করছি।

অতএব সুনিশ্চিত জানা আবশ্যক যে, তা এক কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন জাতীয় বিষয় ছিল যা ক্রুশীয় ঘটনার পর কোন কোন পবিত্রচেতা ব্যক্তি স্বপ্নের ন্যায় অবলোকন করেছিলেন যেন পবিত্র মৃতব্যক্তিরা জীবিত হয়ে নগরে চলে এসেছেন এবং মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। স্বপ্নের যেমন নিজস্ব ব্যাখ্যা বা তা'বীর রয়েছে, যেমন খোদার পবিত্র গ্রন্থাবলীতেও লিপিবদ্ধ আছে- উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তেমনি এ স্বপ্নটিরও নিজস্ব এক ব্যাখ্যা ছিল। আর সে ব্যাখ্যাটি ছিল হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি। বরং খোদা তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, এ ব্যাখ্যাটি আমি কোথা থেকে জানতে পারলাম তাহলে এর উত্তর হলো, স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিদ ইমামগণ তদ্রূপই লিখেছেন এবং সকলেই তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতএব আমি এখানে প্রাচীন কালের একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বিশারদ অর্থাৎ 'তা'তীরুল আনাম' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবের প্রণেতার দেয়া ব্যাখ্যা মূল ভাষ্যসহ নিম্নে উদ্ধৃত করছিঃ

من رأى أنّ الموتٰى وثبوا من قبورهم و رجعوا الٰى
دورهم فانه يطلق من فى السجن

('তাতীরুল আনাম ফি তাবীরিল মানাম- কুতবুয্যামান শায়খ আব্দুল গনী নাবলুসী প্রণীত, পৃষ্ঠা ২৮৯।)

অর্থাৎ 'যদি কেউ স্বপ্ন দেখে বা কাশ্ফের ধারায় দর্শন করে যে, মৃতরা কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে ও তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরেছে, তাহলে এর তা'বীর বা ব্যাখ্যা হচ্ছে, এক বন্দী তার বন্দীশালা থেকে রেহাই পাবে এবং জালেমদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে'। বর্ণনা-ধারায় প্রতীয়মান হয়, সে কোন সাধারণ বন্দী নয় এবং সে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বন্দী। এখন লক্ষ্য করুন, এ ব্যাখ্যাটি কত যুক্তিসঙ্গতভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর

ওপর প্রযোজ্য হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায়, এ ইঙ্গিতকেই স্পষ্টত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে (স্বপ্নে) পরলোকগত পুণ্যাত্মাদেরকে জীবিত হয়ে নগরে প্রবেশ করতে দেখা যায়, যেন (এতে) সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা বুঝে নেয় যে, হযরত মসীহ্কে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

এমনি ধারায় ইঞ্জিলগুলোতে আরও অনেক জায়গায় স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি বরং নিষ্কৃতি লাভের পর অন্য কোন দেশে চলে যান। কিন্তু যতটুকু আমি বর্ণনা করেছি তা ন্যায়বিচার ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বোঝার জন্যে যথেষ্ট।

হয়ত কারও কারও মনে এ আপত্তি বা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, ইঞ্জিলগুলোতে তো বার বার এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধাবস্থায় মারা যান, তারপর পুনর্জীবিত হয়ে আকাশে চলে যান। এ ধরনের আপত্তির জবাব পূর্বে আমি সংক্ষেপে দিয়ে এসেছি। এখন আবারও এটুকু বর্ণনা করে দেয়া সমীচীন মনে করি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশীয় ঘটনার পর যখন তাঁর শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, গালীল পর্যন্ত সফর করেন, রুটি ও কাবাব খান, তাঁর দেহের ক্ষত স্থানগুলো দেখান, ইম্মাউস নামক স্থানে শিষ্যদের সাথে একত্রে রাত যাপন করেন ও পীলাতের রাজ্য থেকে সংগোপনে পলায়ন করেন এবং নবীদের সুন্নত অনুযায়ী সে দেশ থেকে হিজরত করেন ও ভয়ে ভয়ে যাত্রা করেন, তখন এ যাবতীয় ঘটনা-ই প্রমাণ করে ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, তিনি ক্রুশে মারা যান নি। বরং নশ্বর দেহের যাবতীয় গুণ ও লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল এবং অভিনব কোন পরিবর্তন ঘটে নি। আর আকাশে উঠে যাওয়ার কোন চাক্ষুষ সাক্ষ্য ইঞ্জিল থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। *

এরূপ সাক্ষ্য থাকলেও তা আস্থা যোগ্য হতো না। কেননা ইঞ্জিল রচয়িতাদের এ স্বভাবই প্রতীয়মান হয় যে, তারা কথাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেন এবং সামান্য একটি বিষয়কে রঙ চড়িয়ে পাহাড় বানিয়ে দেন। যেমন, কোন ইঞ্জিল রচয়িতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'মসীহ্ খোদার পুত্র।' তখন

** টীকা ঃ কেউ বর্ণনা করে না যে, সে একথার সাক্ষী এবং সে নিজ চোখে তাঁকে আকাশে উঠে যেতে দেখেছে।-গ্রন্থকার*

ইঞ্জিলের আরেক রচয়িতা তাঁকে পূর্ণাঙ্গ খোদা বানিয়ে দিতে চিন্তা মগ্ন হন। আর তৃতীয়জন তাঁকে সমস্ত আকাশ ও জগতের ক্ষমতা দিয়ে দেন এবং চতুর্থজন প্রকাশ্যভাবে বলে ওঠেন, 'তিনিই সবকিছু; তিনি ছাড়া কোন খোদা নেই।' মোট কথা, এভাবে অতিশয়োক্তি তাদেরকে বহু দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, যে স্বপ্নটিতে মৃতদেরকে দেখা গিয়েছিল তারা যেন কবর থেকে উঠে এসে নগরে প্রবেশ করেছে, সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থের ওপর জোর দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই মৃতরা কবর থেকে বেরিয়ে সত্যি সত্যি জেরুযালেমে ঢুকে নগরবাসীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এখন ভেবে দেখুন, (তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যেমন) একটি পালক থেকে কাক বানানো হয়। এরপর তা কেবল একটি থাকে না, বরং লক্ষ লক্ষ কাক বানিয়ে ওড়ানো হয়। কাজেই যেখানে অতিশয়োক্তির এহেন অবস্থা, সেখানে প্রকৃত সত্যের সন্ধান কি করে লাভ করা যায়? লক্ষণীয় বিষয় হ'ল খোদার কিতাব বলে অভিহিত এ ইঞ্জিলগুলোতে এমন সব অতিশয়োক্তিও করা হয়েছে, যেমন এতে লেখা আছে, 'মসীহ্ যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করেছেন সেসব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হলে তা পৃথিবীতে সংকুলান হতো না।' এতো অতিশয়োক্তি কি কোন সততা ও সরলতার রীতি? এ কি সত্য ও সঙ্গত নয় যে, মসীহ্র কর্মকান্ড এমনই সীমাহীন হয়ে থাকলে তা কী করে তিন বছর সময়-সীমার আওতায় এসে গেল? ইঞ্জিলগুলোতে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর কিছু ভুল উদ্ধৃতিও দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্র বংশ তালিকাও তারা শুদ্ধভাবে লিখতে পারে নি। ইঞ্জিলগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, এসব (ইঞ্জিল রচয়িতা) বুযুর্গ কিছু মোটা বুদ্ধির লোক ছিলেন; এমন কি তাদের কেউ কেউ হযরত মসীহ্কে ভূত বলে ভেবে বসেছিলেন। এ ইঞ্জিলগুলোর প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ন থাকার বিরুদ্ধেও পূর্বকাল থেকে অভিযোগে চলে এসেছে। বিশেষত যেখানে ইঞ্জিলের নামে আরও অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, সেখানে ওগুলোতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর সবটাই কেন বাতিল করা হবে আর কেনই বা এ (প্রচলিত) ইঞ্জিলগুলোর লেখা সাকল্য বিষয়কে মেনে নিতে হবে? অথচ এর পক্ষে আমাদের কাছে অকাট্য কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। অন্য ইঞ্জিলগুলোতে কখনও এতো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি না, যেমন এ চার ইঞ্জিলে অদ্ভুত এমন সব বিষয় বিদ্যমান

যে, এক দিকে তো এ পুস্তকগুলোকে মসীহ্‌র পাক-পবিত্র ও নির্দোষ চাল-চলন স্বীকার করা হয়, কিন্তু অন্য দিকে আবার তাঁর প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যা কখনও কোন সত্যপরায়ণ মহাপুরুষের ক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন, ইস্রাঈলী নবীরা সাধারণত তওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী পবিত্র লোকের বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এককালীন শত শত স্ত্রী গ্রহণ করলেও আপনারা নিশ্চয় কখনও শোনেন নি, কোন নবী কখনও উশৃঙ্খলতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, কোন অশুচি দুশ্চরিত্রা নারীকে এবং শহরের কুখ্যাত পতিতাকে তিনি নিজ দেহ স্পর্শের ও তাঁর মাথায় হারাম উপায়ে উপার্জিত তেল মালিশের এবং তাঁর পায়ে তার কেশ মর্দনের প্রশ্রয় দিয়েছেন আর এসব কিছু একজন খারাপ ধ্যান-ধারণার যুবতী নারীকে করতে দিয়েছেন এবং তাকে নিষেধ করেন নি। এ ক্ষেত্রে কেবল সুধারণার কল্যাণে মানুষ সেসব আপত্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে যা এহেন দৃশ্যাবলী দেখে স্বভাবত সৃষ্টি হয়। তবুও এ দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য ভাল নয়। মোট কথা, এ ইঞ্জিলগুলোতে বহুল পরিমানে এমন বিষয় রয়েছে যাতে প্রতিয়মান হয় যে এ ইঞ্জিলগুলো নিজ মূল ভাষ্য রক্ষা করতে পারে নি অথবা এগুলোর রচয়িতা হাওয়ারী তথা শিষ্য নয় বরং অন্য কেউ। যেমন, মথি লিখিত ইঞ্জিলে (২৮ঃ১৫) এ বাক্যটি রয়েছে ঃ 'এবং ইহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটাই প্রচলিত আছে'। অতএব এর লেখক হিসাবে মথিকে নির্ধারণ করা কি সঠিক ও সমীচীন হতে পারে? এতে কি প্রতীয়মান হয় না, এ ইঞ্জিলটির লেখক মথির মৃত্যুর পরে অন্য কোন ব্যক্তি ছিল? তেমনি, মথি লিখিত ইঞ্জিলেই ২৮ অধ্যায়ের ১২ ও ১৩ শ্লোকে লেখা আছে ঃ

> 'তখন তাহারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) প্রবীণবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া সেই সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার (অর্থাৎ মসীহ্‌র) শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।' (মথি ২৮:১২-১৩)

কত অন্তঃসারশূন্য ও অযৌক্তিক কথাবার্তা! এসব কথার যদি অর্থ হয়, যীশু (মসীহ্ নিজ) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার বিষয়টি গোপন

করতে চেয়েছিলেন এবং তারা (ইহুদীরা) প্রহরারত সৈন্যদের এ উদ্দেশ্যে ঘুষ দিয়েছিল যাতে সে মহান মু'জিযাটি তাদের জাতির মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করতে না পারে, তাহলে যীশু কেন তা গোপন রাখলেন? অথচ তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁর সে মু'জিযাকে ইহুদীদের মাঝে প্রকাশ ও প্রচার করা। তা না করে বরং অন্যদেরকেও তিনি জীবিত আছেন বলে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। যদি বলেন, তাঁর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল, তাহলে আমি বলবো, একবার যখন তাঁর ক্ষেত্রে আল্লাহ্তাআলার শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটে গেলো এবং তিনি মারা গেলেও ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে যখন জীবিত হয়ে উঠলেন, তখন আবার ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাঁর কিসের ভয় ছিল? কেননা তখন ইহুদীরা কোনভাবেই তাঁকে কাবু করতে সক্ষম হতো না। কেননা তখন তো তিনি নশ্বর জীবনের ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছিলেন। আফসোস! এক দিকে তাঁর ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে পুনর্জীবন, শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ ও গালীলের দিকে যাত্রা, তারপর আকাশে (তাঁর) উর্দ্ধাগমনের কথা বর্ণনা করা হয়, আবার অন্য দিকে এ ঐশ্বরিক দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পদে পদে তিনি ইহুদীদেরকে ভয় পান এবং ইহুদীরা যেন তাঁকে দেখে না ফেলে সেজন্য সে দেশ থেকে তিনি গোপনে পলায়ন করেন, আর প্রাণ রক্ষার্থে গালীলের দিকে সত্তর মাইল ব্যাপী পদযাত্রা করেন। আর বার বার নিষেধ করেন যেন এ ঘটনা কাউকে বলা না হয়। এ সবই কি ঐশ্বরিক দেহের গুণ ও লক্ষণ? না, বরং প্রকৃত ঘটনা হলো, ঐশ্বরিক বা নূতন কোন দেহ ছিল না, বরং কেবল সেই ক্ষত-বিক্ষত দেহই ছিল, যা প্রাণে রক্ষা পায়। আর ইহুদীদের দিক থেকে তবুও যেহেতু আশঙ্কা ছিল সেহেতু জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বনের বিষয়ে খেয়াল করে হযরত মসীহ্ সে দেশ ত্যাগ করেন। এর বিপরীতে যে সব কথা বর্ণনা করা হয় তা সবই বাজে ও অন্তঃসারশূন্য। যেমন বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরা পাহারাদার সৈন্যদেরকে ঘুষ দেয় এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যে, সৈন্যরা যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন মসীহ্র শিষ্যরা তাঁর শবদেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। তারা ঘুমিয়ে থাকলে সঙ্গত কারণেই তাদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, ঘুমিয়ে থেকে তারা কী করে জানলো মসীহ্র লাশ তাঁর শিষ্যরা চুরি করে নিয়ে গেছে? আর কবর কেবল লাশ-শূন্য থাকায় কোন বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কী করে বুঝতে পারতো যে, মসীহ্ আকাশে উঠে গেছেন? দুনিয়াতে অন্য কোন

কারণেই কি কবরগুলো খালি পড়ে থাকে না? অতএব আকাশে উঠে যাবার সময় এর সাক্ষ্য-প্রমাণস্বরূপ মসীহ্‌র দায়িত্ব ছিল দু'তিনশ' ইহুদীর সাথে দেখা করা এবং পীলাতের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করা। ঐশ্বরিক দেহ থাকতে তাঁর কিসের ভয় ছিল? কিন্তু তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেন নি বরং বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে বিন্দুমাত্র কোন প্রমাণ পেশ না করে অত্যন্ত আতঙ্ক নিয়ে গালীলের দিকে পলায়ন করেন। কাজেই আমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস রাখি ও স্বীকার করি যে, প্রশস্ত ও জানালা বিশিষ্ট হাওয়াদার কবরটি থেকে তাঁর বেরিয়ে আসা এবং গোপনে হাওয়ারীদের সাথে সাক্ষাৎ করা সত্য হলেও তাঁর যে কোন অভিনব ও ঐশ্বরিক দেহ লাভ হয়েছিল তা কখনও সত্য নয়। বরং তাঁর সেই একই ক্ষত-বিক্ষত দেহ ছিল এবং তাঁর মনে অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে পুনরায় ধরা পড়ার সে একই আতঙ্ক ছিল। মথি লিখিত ইঞ্জিলের ২৮ অধ্যায়ের আয়াত ৭-১০ গভীরভাবে পড়ে দেখুন। এ সব আয়াতে স্পষ্ট লেখা আছে, মসীহ্ জীবিত আছেন ও গালীলের দিকে যাচ্ছেন বলে গোপনে যেসব মহিলাকে কেউ জানিয়েছিল এবং শিষ্যদেরকেও এ সংবাদ দেয়ার জন্য বলেছিল, সে মহিলারা তা শুনে অবশ্যই খুশী হয়েছিল, কিন্তু তখনও কোন দুষ্ট ইহুদী কর্তৃক তিনি ধৃত হবার আশঙ্কায় তারা মহা আতঙ্কিত মনে রওয়ানা হয়েছিল। আর ৯নং আয়াতে আছেঃ 'ওই মহিলারা যখন শিষ্যদেরকে সংবাদ দিতে যাচ্ছিল তখন মসীহ্ তাদের সাথে দেখা করে সালাম বলেন।' আর ১০ আয়াতে আছে, যীশু তাদেরকে বলেন, 'ভয় করো না অর্থাৎ আমার ধৃত হবার আশঙ্কা করো না। তবে আমার ভাইদেরকে গালীলে যেতে বলবে।* সেখানে আমাকে তারা দেখতে পাবে। অর্থাৎ শত্রুদের আশঙ্কার দরুন এখানে আমি অবস্থান করতে পারি না।' মোট কথা, মসীহ্ মারা যাওয়ার পর ঐশ্বরিক

** টীকা ঃ এ স্থলে হযরত মসীহ্ সেই মহিলাদেরকে এ কথা বলে আশ্বস্ত করেন নি যে, তিনি এবার নূতন ও ঐশ্বরিক দেহ নিয়ে পুনর্জীবিত হয়েছেন, এখন কেউ তাঁকে আর ধরতে পারবে না। বরং মহিলাদেরকে দুর্বল দেখে সাধারণভাবে আশ্বস্ত করেছেন, যেমন কিনা পুরুষরা সর্বদা এমন অবস্থায় সেভাবে আশ্বস্ত করে থাকে। মোট কথা, ঐশ্বরিক দেহের কোন প্রমাণ দেন নি বরং শরীরের মাংস ও হাড় দেখিয়ে জাগতিক দেহেরই প্রমাণ দিয়েছেন।- গ্রন্থকার*

দেহ নিয়ে পুনর্জীবিত হয়ে থাকলে এর প্রমাণ দেয়া তাঁরই দায়িত্ব ছিল, যেন তিনি ইহুদীদেরকে তাঁর সেই ঐশ্বরিক জীবনের প্রমাণ পেশ করতেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি এর প্রমাণ উপস্থাপনের দায়ভার হতে মুক্ত হন নি। ইহুদীরা হযরত মসীহ্র পুনর্জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেখাবার পথ রোধ করে দিয়েছিল- ইহুদীদেরকে এ অভিযোগ দেয়া প্রকৃতপক্ষেই এক প্রকাশ্য বাতুলতা। বরং মসীহ্ নিজেই তাঁর পুনর্জীবনের স্বপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ পেশ করেন নি। বরং পলায়ন, আত্মগোপন, খাদ্যগ্রহণ, নিদ্রাযাপন ও ক্ষত দেখানোর মাধ্যমে তিনি যে ক্রুশে মারা যান নি এরই প্রমাণ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

﴾মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে উদ্ধার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও প্রামাণ্য হাদীসাবলী থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ﴿

এখন যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ এ অধ্যায়ে আমি তুলে ধরতে যাচ্ছি, এগুলো খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে বাহ্যত নিষ্ফল বলে মনে হতে পারে কেননা,তারা পবিত্র কুরআন বা হাদীসকে আলোচ্য বিষয়ে অকাট্য যুক্তি হিসেবে মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু আমি এগুলো কেবল এ উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করছি যাতে খৃষ্টানগণ কুরআন করীম ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি মু'জিযা (অলৌকিকত্ব) সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের নিকট এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শত শত বছর পরে এখন যে সব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা কুরআন করীম ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পূর্বেই বর্ণনা করেছিলেন। অতএব এগুলোর কিছু সংখ্যক নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেন ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ (সূরা নিসা 4ঃ158)

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরা হযরত মসীহ্‌কে হত্যা করতে পারে নি এবং ক্রুশবিদ্ধ করেও মারতে পারে নি। বরং তিনি ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় মারা গিয়েছেন বলে তাদের মনে কেবল এক সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের কাছে তেমন কোন দলিল-প্রমাণ নেই যার দরুন তাদের অন্তর নিশ্চিৎ হতে পারতো যে, হযরত মসীহ্‌ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সত্যি সত্যি মারাও গিয়েছিলেন।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌তাআলা বর্ণনা করেন, যদিও এটা সত্য যে, মসীহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং তাঁকে মেরে ফেলতে

তারা সংকল্পবদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষেই তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষে মনে করে নেয়া নিছক একটা ধোঁকা বৈ কিছু নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলা এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে দেন যার দরুন তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা পান। এখন ন্যায়বিচারের দাবী অনুযায়ী অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, কুরআন করীম ইহুদী ও খৃষ্টানদের বরখেলাফে যা বলেছিল কেবল তা-ই পরিণামে সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগের অতি উচ্চমানের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মসীহ্কে প্রকৃতপক্ষেই ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রামাণ্য গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, হাড়গোড় ভাংগা ছাড়াই কেবল দু'তিন ঘন্টার জন্যে ক্রুশবিদ্ধ থাকায় হযরত মসীহ্ কী করে মারা গেলেন ইহুদীরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সর্বদাই অক্ষম থাকে।

এ কারণেই বাধ্য হয়ে কিছু সংখ্যক ইহুদী নূতন এক কথা বানায়। তারা বলে, মসীহ্কে তারা নাকি তলোয়ারের দ্বারা হত্যা করেছিল। অথচ ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাস অনুযায়ী হযরত মসীহ্কে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্তাআলার কী শান যে, মসীহ্কে উদ্ধারকল্পে অন্ধকার ছেয়ে গেলো, ভূমিকম্প এলো, পীলাতের স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখানো হলো, সাবাতের রাত আসন্ন হয়ে পড়লো যখন ক্রুশবিদ্ধ কাউকেই আর ক্রুশের ওপরে রাখা সঙ্গত ছিল না, ভীতিপ্রদ স্বপ্নের কারণে হাকিমের অন্তর মসীহ্কে রক্ষা করায় মনোযোগী হলো। সহসা একযোগে এ যাবতীয় ঘটনার উদ্ভব আল্লাহ্তালা এজন্যেই ঘটালেন যাতে মসীহ্র প্রাণ রক্ষা করা হয়। তা ছাড়া, মসীহ্কে সংজ্ঞাহীন করে দিলেন, যেন সবার কাছে তিনি মৃত বলে প্রতীয়মান হন। আর ভূমিকম্প ইত্যাদি ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক নিদর্শন দেখিয়ে ইহুদীদের মাঝে কাপুরুষতা, ভয়-ভীতি ও ঐশী শাস্তির আশঙ্কাবোধ সৃষ্টি করে দিলেন। তা ছাড়া, এ আতঙ্ক তাদের তাড়া করছিল যে, সাবাতের রাতে লাশগুলো যেন ক্রুশের ওপরে থেকে না যায়। আবার এ-ও হলো, ইহুদীরা মসীহ্কে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখে তিনি মারা গিয়েছিলেন বলে ধরে নিল। অন্ধকার, ভূমিকম্প ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাই বাড়ী-ঘর সম্পর্কেও তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ভূমিকম্প ও অন্ধকারের দরুন হয়তো পরিবার-পরিজনদের ওপর দিয়ে কত কী বিপদ ঘটে যাচ্ছে! আর এ ভীতিও তাদের

অন্তরে প্রবলভাবে ছেয়ে যায় যে, এ ব্যক্তি (মসীহ্) যদি তাদের ধারণানুযায়ী মিথ্যেবাদী ও কাফিরই হতো, তাহলে তাকে নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট দেয়ার বেলায় এমন ভয়াবহ লক্ষণাবলী কেন প্রকাশিত হলো যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা দেয় নি? কাজেই তারা উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে পড়ার কারণে মসীহ্ মারা গেছেন, না তার অন্য কিছু হয়েছে তা লক্ষ্য করার মত তাদের অবস্থাই ছিল না। তবে প্রকৃতপক্ষে এ যাবতীয় বিষয় ছিল মসীহ্কে রক্ষা করার লক্ষ্যে ঐশী- পরিকল্পনা বিশেষ। এ দিকেই এ আয়াতটিতে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ **ওয়া লাকিন শুব্বিহা লাহুম** অর্থাৎ ইহুদীরা মসীহ্কে হত্যা করতে পারে নি, বরং আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে কেবল এ সন্দেহের আবর্তে ফেলে দেন, যেন তারা তাকে হত্যা করেছে। এতে তাঁর ফযল ও অনুগ্রহের ওপর তাঁর সত্যপরায়ণ বান্দাদের আশা-ভরসা বৃদ্ধি পায়, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে বাঁচাতে পারেন।

কুরআন করীমে হযরত মসীহ্ সম্পর্কে এ আয়াতটিও রয়েছে ঃ

وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (আলে ইমরান 3 ঃ 46)

এর অর্থ হলো, দুনিয়াতেও মসীহ্কে তার জীবদ্দশায় ঐশ্বর্য অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে মাহাত্ম্য ও বুযুর্গী প্রদান করা হবে এবং আখেরাতেও (প্রদান করা হবে)। এখন এটা স্পষ্ট যে, হেরড ও পীলাতের দেশে হযরত মসীহ্ কোন সম্মান ও মর্যাদা পান নি, বরং তাঁকে চরম পর্যায়ে লাঞ্ছিত করা হয়। পক্ষান্তরে এ ধারণা যে, দুনিয়াতে তিনি পুনরায় এসে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন এটা এক অলীক ধারণা মাত্র, যা খোদাতাআলার গ্রন্থাবলী এবং তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী। তদুপরি এটা এক প্রমাণবিহীন বিষয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ও সত্য বিষয় হলো, হযরত মসীহ্ (আঃ) এ হতভাগ্য অভিশপ্ত জাতির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পর যখন পাঞ্জাব অঞ্চলে আসলেন এবং একে তাঁর শুভাগমনে সম্মানিত করলেন, তখন এ দেশে খোদাতাআলা তাঁকে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করলেন এবং বনী ইস্রাঈলের হারানো সেই দশটি গোত্রকেও তিনি খুঁজে পেলেন। প্রতীয়মান হয়, বনী ইস্রাঈলের অধিকাংশই এ দেশে আসার পর বৌদ্ধধর্মে

দীক্ষিত হয়ে পড়েছিল আর তাদের কিছু সংখ্যক লোক অতি নীচু স্তরের প্রতিমা পূজায় ফেঁসে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্র এ দেশে আগমনে তাদের অধিকাংশ সত্য পথে ফিরে আসে। আর যেহেতু হযরত মসীহ্র আহ্বান-বাণীতে আগমনকারী নবীকে গ্রহণ করার জন্য তাগিদপূর্ণ নির্দেশ ছিল, সেহেতু সেই দশটি গোত্র, যারা এ দেশে আগমনের পর আফগান ও কাশ্মীরী বলে পরিচিত হলো তারা পরিশেষে সবাই মুসলমান হয়ে গেলো। মোট কথা, হযরত মসীহ্ এ দেশে অতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন। সাম্প্রতিককালে এ পাঞ্জাব অঞ্চল থেকেই একটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নাম পালী ভাষায় খোদিত আছে। এ মুদ্রাটি সে যুগেরই যা ছিল হযরত মসীহ্র যুগ। এতে সুনিশ্চিত প্রতীয়মান হয়, হযরত মসীহ্ এ দেশে আসেন এবং রাজকীয় সম্মান লাভ করেন। খুব সম্ভব এ মুদ্রা এমন কোন রাজা কর্তৃক প্রচলিত হয় যিনি হযরত মসীহ্র প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আরেকটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে একজন ইস্রাঈলী পুরুষের ছবি (অঙ্কিত) রয়েছে। এটিও হযরত মসীহ্রই প্রতিকৃতি বলে বোঝা যায়। কুরআন করীমে আরেকটি আয়াত রয়েছে, যাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, মসীহ্কে খোদা এতো আশিস ও কল্যাণ দান করেছেন যে, তিনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আশিসমন্ডিত হবেন (সূরা মরিয়ম ঃ রুকু ২)। সুতরাং এ সকল মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ ও আশিস লাভ করেছিলেন। তিনি রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত মারা যান নি।

অনুরূপ, কুরআন করীমে আরও একটি আয়াত রয়েছে ঃ

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (সূরা আলে ইমরান 3ঃ56)

অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে অভিযোগ মুক্ত করবো ও তোমার পবিত্রতা সাব্যস্ত করবো এবং সেসব অপবাদ দূর করে দেব, যা তোমার বিরুদ্ধে ইহুদী ও খৃষ্টানরা আরোপ করেছে। এ ছিল এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী। এর সারকথা হলো, ইহুদীরা দোষারাপ করেছিল যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার দরুন নাউযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত হয়ে তাঁর অন্তর থেকে খোদার ভালবাসা

তিরোহিত হয়েছিল। লা'নত শব্দের মর্মে নিহিত শর্ত অনুযায়ী তাঁর হৃদয় বিপথগামী হয়ে খোদার প্রতি বিমুখ ও ঘোর আঁধারে ডুবে গিয়েছিল। পাপাসক্ত হয়ে সকল পুণ্যের বিরোধী এবং খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শয়তানের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়েছিল এবং খোদা ও তাঁর মাঝে সত্যি সত্যি শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল। আর অভিশপ্ত হবার একই অপবাদ খৃষ্টানরাও আরোপ করেছিল। কিন্তু খৃষ্টান নিজেদের অজ্ঞতাবশত পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয়কে একই জায়গায় জুড়ে দেয়। একদিকে তো তারা হযরত মসীহ্কে খোদার পুত্র বলে, অপর দিকে সেই সাথে তাঁকে অভিশপ্তও বলে। অধিকন্তু তারা স্বীকার করে, অভিশপ্ত ব্যক্তি আঁধার ও শয়তানের সন্তান অথবা স্বয়ং শয়তান হয়ে থাকে। অতএব হযরত মসীহ্র প্রতি অত্যন্ত অপবিত্র এসব অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। তবে **'মুতাহ্হিরুকা'** আয়াতটির ভবিষ্যদ্বাণীতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, এমন এক যুগ আসন্ন, যখন খোদাতাআলা হযরত মসীহ্কে এসব অপবাদ থেকে পবিত্র সাব্যস্ত করবেন। অতএব এটাই সে যুগ।

যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর পবিত্রতা সাব্যস্তকরণ বুদ্ধিমান লোকেদের দৃষ্টিতে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্যের দ্বারাও হয়ে যায়। কেননা আঁ হযরত (সাঃ)ও কুরআন করীম সাক্ষ্য দেয়, হযরত ঈসা (আ.)- এর প্রতি আরোপিত সব অভিযোগই মিথ্যা। কিন্তু এ সাক্ষ্য সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-নির্ভর ও অস্পষ্ট ছিল। সে কারণে ঐশী ন্যায়নীতি এটাই চায়, হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করা যেমন একটি সুখ্যাত ও দৃশ্যমান ঘটনা ছিল, তেমনি তাঁকে পবিত্র ও নির্দোষ সাব্যস্ত করাও যেন সবার দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট ও পরিদৃশ্যমান বিষয়ে পরিণত হয়। অতএব সেভাবেই ঘটে গেলো। অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতা এখন আর কেবল যুক্তি-নির্ভর নয়, বরং সবার কাছে স্পষ্টভাবে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়েছে। কেননা লক্ষ লক্ষ মানুষ চাক্ষুষভাবে দেখতে পাচ্ছে, হযরত ঈসার কবর শ্রীনগর-কাশ্মীরে বিদ্যমান। আর যেমনটি গিলগিট (গলগথা) অর্থাৎ শ্রীর স্থানে হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তেমনি শ্রীর স্থান অর্থাৎ শ্রীনগরে তাঁর সমাহিত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। উভয় স্থানের নামে শ্রী শব্দটি থাকা অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অর্থাৎ যে স্থানটিতে হযরত মসীহ্কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সে স্থানটির নামও গিলগিট বা শ্রী এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে

যেখানে হযরত মসীহ্র সমাধি প্রমাণিত হয়েছে সে স্থানটির নামও গিলিগিট তথা শ্রী। কাশ্মীর এলাকার অন্তর্গত গিলিগিট শ্রীর দিকেই এক ইঙ্গিত বটে। খুব সম্ভব এ শহরটি হযরত মসীহর যুগেই স্থাপন করা হয়েছিল এবং ক্রুশীয় ঘটনার স্থানীয়ভাবে স্মারক হিসেবে এর নাম গিলিগিট তথা শ্রী রাখা হয়, যেমন লাসা যা একটি হিব্রু শব্দ, এর অর্থ উপাস্যের শহর। এটিও হযরত মসীহ্র যুগেই স্থাপিত হয়।

হাদীসের সহী রিওয়ায়াত সমূহের দ্বারা প্রমাণিত যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মসীহ্ একশ' পঁচিশ বছর আয়ু লাভ করেছিলেন।' ইসলামের সকল ফির্কা স্বীকার করে, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মাঝে এমন দুটি বিষয় একত্র হয়েছিল যা অন্য কোন নবীর মাঝে একত্র হয় নি-

(১) তিনি পরিপূর্ণ আয়ু লাভ করেন অর্থাৎ একশ' পঁচিশ বছর জীবিত থাকেন।

(২) তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখন্ড ভ্রমণ করেন। সে কারণেই তাঁকে 'সাইয়াহ্ তথা পর্যটক নবী' বলা হয়। এখন এটা স্পষ্ট যে, তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে যদি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়ে তাকে তাহলে ১২৫ বছর সংক্রান্ত হাদীস সত্য সাব্যস্ত হতে পারতো না। আর না এত অল্প বয়সে অর্থাৎ মাত্র তেত্রিশ বছরে তিনি এত ভ্রমন করতে পারতেন। অথচ এ সকল রিওয়ায়াত প্রামাণ্য, ও প্রাচীন হাদীস-গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বরং মুসলমানদের সকল ফির্কায় এগুলো এত ধারাবাহিককভাবে সুখ্যাত যে, এর চেয়ে বেশি সুখ্যাতি কল্পনা করা যায় না। হাদীসের এক 'জামে' কিতাব 'কানযুল উম্মালে'র ২য় খন্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ

اوحى اللّٰه تعالٰى الٰى عيسٰى ان ياعيسٰى انتقل من
مكان الٰى مكان لئلّا تعرف فتؤذٰى [1]

অর্থাৎ আল্লাহ্তালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠান, হে ঈসা! তুমি এক জায়গা থেকে আরো জায়গায় স্থানান্তরিত হতে থাক, অর্থাৎ এক

দেশ থেকে অন্য দেশের দিকে যাও, যাতে কেউ তোমাকে চিনতে পেরে কষ্ট না দেয়। তারপর এ গ্রন্থেই জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস লিপিবদ্ধ আছে ঃ

كان عيسى ابن مريم يسيح فاذا امسٰى اكل بقل الصحراء و يشرب الماء القراح [2]

অর্থাৎ, 'হযরত ঈসা (আঃ) সর্বদা ভ্রমণ করতেন ও এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত হতেন। সন্ধ্যা নেমে এলে তিনি জঙ্গলের শাক-সব্জি খেয়ে নিতেন এবং নির্মল বিশুদ্ধ পানি পান করতেন (কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৭১ পৃঃ)। এরপর এ গ্রন্থেই আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال احب شيء الى اللّٰه الغرباء قيل اى شيء الغرباء، قال الذين يفرّون بدينهم و يجتمعون الٰى عيسى ابن مريم [3]

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলেন সেই সকল লোক যারা 'গরীব'। জিজ্ঞেস করা হলো, গরীব এর কী অর্থ? তিনি বললেন, 'তারা সেই সব লোক যারা দীন অবলম্বন করে নিজ দেশ থেকে মসীহ্র দিকে পলায়ন করে' (৬ষ্ঠ খন্ড, ৫১ পৃঃ)।

1- দেখুন كنز العمال الكتاب الثالث من حرف الهمزة الباب الاول فى الاخلاق و الافعال المحمودة – فصل خوف العاقبة – رقم الحديث ٥٩٥٥

2- يشرب শব্দটি মুদ্রণজনিত ত্রুটি। এটা شرب হবে। দেখুন- كنز العمال الكتاب الثالث من حرف الهمزة – الباب الاول فى الاخلاق و الافعال المحمودة – فصل الصبر على انواع البلايا و المكاره – رقم الحديث ٦٨٥٢)

3- দেখুন كنز العمال كتاب الفتن من قسم الافعال – فصل في الوصية فى الفتن printed at Daira-tul-Maarif Al-Nizamia Press, Hyderabad, India, 1313 Hijra. (প্রকাশক -কাদিয়ান)

তৃতীয় অধ্যায়

চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ

হযরত মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বপক্ষে এক উচ্চ পর্যায়ের সাক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রের শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 'মারহামে ঈসা' নামের একটি মলমের ব্যবস্থাপত্র। এটি এমন এক প্রমাণ যা না মানলেই নয়। এ সব গ্রন্থের কোন কোনটি খৃষ্টানদের প্রণীত। আবার কোন কোনটির প্রণেতা মাজুসী (পার্সী) অথবা ইহুদী। আর কোন কোনটির লেখক মুসলমান। এবং এ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ অতি প্রাচীন কালের। গবেষণায় জানা যায়, প্রথমত মৌখিকভাবে এ মলমের প্রণয়ন-পত্রটি মানুষের মাঝে সুখ্যাত হয়ে পড়ে। এরপর মানুষ তা লিপিবদ্ধ করে নেয়। প্রথমে হযরত মসীহ্‌র যুগেই ক্রুশীয় ঘটনার সামান্য কিছুকাল পর রোমান ভাষায় ঔষধ-প্রণয়নপত্রের একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রণীত হয়। এতে এ মলমের ব্যবস্থা-পত্র বা ফর্মূলাটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল এবং এতে বলা হয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষতগুলোর জন্যে এ ব্যবস্থাপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরপর সেই ঔষধ-প্রণয়নপত্রের সংকলন-গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অবশেষে মামুন-উর-রশিদের যুগে গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। খোদাতাআলার কুদরতের কী অদ্ভূত মহিমা যে, প্রত্যেক ধর্মের বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ তা তাঁরা খৃষ্টান হোন বা ইহুদী, অগ্নি উপাসক হোন বা মুসলমান, সবাই এ মলমের-প্রণয়নপত্রটিকে তাঁদের প্রণীত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর তাঁরা সবাই এ মলমের প্রণয়নপত্রটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্যে তাঁর হাওয়ারীগণ এটি প্রস্তুত করেছিলেন। ঔষধ পত্রের মৌলিক উপাদানাদির গুণাগুণ সংক্রান্ত পুস্তকাবলী পাঠে জানা যায়, এ মলম-প্রণয়নপত্রটি আঘাত বা পতনজনিত ক্ষতে অত্যন্ত কার্যকর। ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্ত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে এবং এতে মস্তকি (*Myrrh*) অন্তর্ভূক্ত থাকায় ক্ষত-স্থানকে পচন থেকেও রক্ষা করে। এ ঔষধটি প্লেগেও ফলপ্রদ এবং সব ধরনের ফোঁড়া ও চুলকানিতেও কার্যকর। ক্রুশে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরে পরে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঐশীবাণীর সাহায্যে, না কি কোন

চিকিৎসাবিদের প্রস্তাবনায় এ মলমটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা নেই। মলমটির কোন কোন মৌলিক উপাদান, বিশেষতঃ মস্তকি (*Myrrh*), যার উল্লেখ তওরাতে এসেছে, তা প্রায় অব্যর্থ নিরাময়ের কাজ করে।

মোট কথা, এ ঔষধটি ব্যবহারে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ক্ষতগুলো কয়েক দিনেই ভাল হয়ে যায় এবং এত শক্তির সঞ্চয় হয় যে, তিনি তিন দিনে জেরুশালিম থেকে গালীলের দিকে সত্তর মাইল পায়ে হেঁটে যান। অতএব এ ঔষধটির কার্যকারিতা ও গুণ সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মসীহ্ তো অন্যদের আরোগ্য করতেন, কিন্তু এ ঔষধটি মসীহ্র আরোগ্য করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের যেসব গ্রন্থে এ মলমের ব্যবস্থাপত্রটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, সংখ্যায় তা সহস্রাধিক। সেগুলোর ফিরিস্তি লিখতে গেলে তা অনেক দীর্ঘ হবে। আর যেহেতু এ ব্যবস্থাপত্রটি ইউনানী চিকিৎসাবিদদের মাঝে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেহেতু আমি সবগুলো গ্রন্থের নাম লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বলে মনে করি না, কেবল কয়েকটির নাম লিখে দিচ্ছি যা এখানে মজুদ রয়েছে-

'মরহামে ঈসা' মলমটির উল্লেখ সম্বলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর ফিরিস্তি, যেগুলোতে এ-ও উল্লেখ রয়েছে যে, এ মলমটি হযরত ঈসার জন্যে অর্থাৎ তাঁর দেহের ক্ষতগুলোর জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল ঃ

* কানূন ঃ শায়খুর রাঈস বু আলী ইবনে সিনা প্রণীত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৩।
* শারাহ্ কানূন ঃ আল্লামা কুতবুদ্দিন শিরাযি প্রণীত, ৩য় খন্ড।
* কামিলুস্ সানাআ' ঃ আলী বিন আল আব্বাস আল মাজুসী প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬০২।
* কিতাব মাজমূআ' বাকায়ী ঃ মাহ্মুদ মুহাম্মদ ইসমাঈল মুখাতাব খাকানবাসী, (পিতার নামানুসারে মুহাম্মদ বাকা খান) প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৭।
* কিতাব তায্কিরা এ উলুল আলবাব ঃ শায়খ দাউদ আল্ যারীর আল্ আনতাকী প্রণীত, পৃঃ ৩০৩
* কারাবাদীন-ই- রূমী ঃ হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর কাছাকাছি সময়ে

সংকলিত মামুনুরী রশিদের সময়ে আরবী ভাষায় অনূদিত (চর্মরোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

* কিতাব উমদাতুল মুহতাজ ঃ আহ্মদ বিন হাসান আল্ রাশীদী আল্ হাকীম প্রণীত। এ গ্রন্থটিতে মারহামে ঈসা এবং অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র একশ' এরও বেশি সংখ্যক গ্রন্থ থেকে নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসবই ফ্রেঞ্চ ভাষায় রচিত গ্রন্থ।
* কিতাব কারাবাদীন ফার্সি ঃ হাকীম মোহাম্মদ আকবর আরযানী প্রণীত (চর্মরোগ সংক্রান্ত)।
* কিতাব শিফাউল আসকাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩০।
* কিতাব মির্য়াতুশ শিফা ঃ হাকীম নাথু শাহ্ প্রণীত (হস্তলিখিত সংস্করণ) চর্মরোগ বিষয়ে।
* যাখীরা- এ- খুওয়ার্জম শাহী, চর্মরোগ বিষয়ে।
* শারাহ্ কানূন গীলানী, ৩য় খন্ড।
* শারাহ্ কানূন ক্বার্শী, ৩য় খন্ড।
* কারাবাদীন, আলাভী খান প্রণীত, চর্মরোগ বিষয়ে।
* কিতাব এলাজুল আমরায ঃ হাকীম মোহাম্মদ শরীফ খান প্রণীত পৃঃ ৮৯৩।
* কারাবাদীন ইউনানী,চর্মরোগ বিষয়ে।
* তোহফাতুল মু'মিনীন, মাখযানুল আদভিয়া-এর টীকায়, পৃঃ ৭১৩।
* মুহীত ফিত্তিব, পৃঃ ৩৬৭।
* কিতাব আকসীর আ'যম, ৪র্থ খন্ড ঃ হাকীম মুহাম্মদ আ'যম্ খান আল্ মুখাতাব বা-নাযেমে জাহাঁ প্রণীত পৃঃ ৩৩১।
* কারাবাদীন মা'সূমী ঃ মা'সূম বিন করীমুদ্দীন আল্ শোস্ত্রী শিরাযী প্রণীত।
* কিতাব উজালা ই নাফেআ ঃ মুহাম্মদ শরীফ দেহ্লভী প্রণীত পৃঃ ৪১০।
* কিতাব তিব্বে শিব্রী, লওয়ামে' শিব্রীয়া নামে প্রসিদ্ধ, সৈয়দ হুসেন শিব্র কাযেমী প্রণীত, পৃঃ ৪৭১।
* কিতাব মাখযানে সোলায়মানী, আকসীর আরাবীর অনুবাদ, অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন বাহাউলপুরী, পৃঃ ৫৯৯।
* শিফাউল আমরায ঃ অনুবাদক মাওলানা আল্ হাকীম মোহাম্মদ নূর

করীম, পৃঃ ২৮২।

* কিতাবুত্তিব দারা শকোহী ঃ নূর উদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম আইনুল মুলক্ আলা শিরাযী প্রণীত, পৃঃ ৩৬০।

* কিতাব মিনহাজুদ দুক্কান বা দস্তরুল আ'ইয়ান ফী আ'মাল ওয়া তার্কীবুন নাফেয়া লিল আবদান ঃ আফলাতুনে যামানা ও রাঈসে আওয়ানা আবুল মানা বিন আবূ নসর আল আত্তার আল্ ইস্রাঈলী আল্হারূনী (অর্থাৎ ইহুদী) প্রণীত, পৃঃ ৮৬।

* কিতাব যুব্দাতুত্তিব ঃ সৈয়্যদুল ইমাম আবূ ইব্রাহীম ইসমাঈল বিন হাসান আল্ হুসেনী আল- জুর্জানী প্রণীত, পৃঃ ১৮২।

* তিব্বে আকবর ঃ মুহাম্মদ আকবর আর্যানী প্রণীত, পৃঃ ২৪২

* কিতাব মীযানুত্তিব ঃ মুহাম্মদ আকবর আর্যানী প্রণীত পৃঃ ১৫২

* সাদীদী ঃ রাঈসুল মুতাকাল্লেমীন ইমামুল মুহাক্কেকীন আল্ সাদীদ আল্ কাযরূনী প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৩।

* কিতাব হাদী কবীর ঃ ইবনে যাকরীয়া প্রণীত (চর্মরোগ বিষয়ে)।

* কারাবাদীন ঃ ইবনে তিলমীয প্রণীত (চর্মরোগ বিষয়ে)

* কারাবাদীন ঃ ইবনে আবি সাদেক প্রণীত (চর্মরোগ বিষয়ে)।

উদাহরণস্বরূপ এ গ্রন্থগুলোর এখানে উল্লেখ করা হলো। বিদ্বান ও শিক্ষিত মানুষ মাত্রই বিশেষত চিকিৎসাবিদগণ জানেন, এ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই ইসলামের প্রাথমিক যুগে বড় বড় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হতো এবং ইউরোপের শিক্ষার্থীরাও এগুলো পাঠ করতেন। একথা সম্পূর্ণ সত্য এবং এতে অতিশয়োক্তির লেশমাত্র নেই যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে প্রায় কোটি কোটি লোক এ সব গ্রন্থের নাম সম্পর্কে অবগত হয়ে এসেছেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এগুলো আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ইউরোপ ও এশিয়ার জ্ঞানী লোকদের মাঝে (কমপক্ষে হলেও) এ ফিরিস্তিতে লিপিবদ্ধ কোন কোন অতি মহান গ্রন্থের নাম সম্পর্কে অনবহিত এমন একজনও নেই। সে যুগে হাস্পনিয়া (স্পেন), কৈসল্লো ও সত্তিরনম* -

** হাস্পনিয়া অর্থাৎ আন্দালুসিয়া; কৈসল্লো অর্থাৎ কুস্তুমুনিয়াহ , সত্তিরনম অর্থাৎ সান্তারিম ।- গ্রন্থকার*

এ যেসব মহা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেগুলোতে ইউরোপের শিক্ষার্থীগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বু আলী সিনা প্রণীত 'আল কানূন', (*Avicenna's Al-Qaanun*) যে মহান গ্রন্থটিতে 'মারহামে ঈসা' নামক মলমের প্রণয়নপত্রের উল্লেখ রয়েছে আর বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন শিফা, ইশারাত ও বিশারাত অতি আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করতেন। তেমনি আবূ নসর ফারাবী, আবূ রায়হান, ইস্রাঈল, সাবিত বিন কুররা, হুনায়ন বিন ইসহাক প্রমুখ রয়েছেন। গ্রীক ভাষা থেকে তাঁদের অনূদিত গ্রন্থাদি পড়ানো হতো। নিশ্চয় এ গ্রন্থগুলোর অনুবাদ ইউরোপের কোথাও কোথাও এখন মজুদ থাকবে। আর যেহেতু মুসলিম শাসকগণ চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির উন্নয়নে আগ্রহী ও পৃষ্ঠাপোষক এবং আন্তরিকভাবে প্রয়াসী ছিলেন, সে জন্যে তাঁরা গ্রীক ভাষায় প্রণীত উত্তম গ্রন্থাবলীর (আরবী ভাষায়) অনুবাদ করান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ এ সকল বাদশাহ্‌র মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা প্রভাবশীল থাকায় তারা রাজ্য বিস্তারের চেয়ে জ্ঞান বিস্তারে অধিক যত্নবান ছিলেন। এসব কারণেই তারা গ্রীক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির আরবী ভাষায় তরজমা করান, কেবল তা-ই নয়, বরং ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞ ও সুদক্ষ পন্ডিতদেরকেও তলব করে বড় বড় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির বিভিন্ন শাখার গ্রন্থাদিরও অনুবাদ করান। অতএব সত্যান্বেষীদের প্রতি তাঁদের (অর্থাৎ উক্ত মুসলিম শাসকদের) এটা এক বিশেষ অনুগ্রহ ও অবদান যে, তাঁরা রোমান ও গ্রীক ইত্যাদি ভাষায় প্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্রের সেই সব (প্রাচীন) গ্রন্থের অনুবাদ করান, যেগুলোতে মরহামে ঈসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা-পত্র লিপিবদ্ধ ছিল, আর এ সম্পর্কে স্পষ্ট ফলকের ন্যায় লেখা ছিল যে, এ মলম হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ ইসলামী যুগের বিজ্ঞ পন্ডিতবর্গ, যেমন সাবেত বিন কুর্‌রা ও হুনায়ন বিন ইসহাক প্রমুখ চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়া গ্রীক ভাষায়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তারা মরহমে ঈসার বর্ণনা সম্বলিত কারাবাদীনের (ঔষধ প্রণয়ন প্রণালী সংক্রান্ত সংকলন গ্রন্থ) আরবী ভাষায় তরজমা করতে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে গ্রীক ভাষার 'শেলীখা' * শব্দটি, যার

** বু আলী সিনা প্রণীত 'আল কানূন' মতে (আবু আলী ইবনে-ই-সিনা রচিত আল্-কানুন ফি আল্-তিব, তৃতীয় খন্ড ৪র্থ অধ্যায়, মলম সম্পর্কিত) ঈসার মলম* ***মারহাম***

অর্থ বার জন, হুবুহু লিখে দেন যাতে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, এ গ্রন্থটি গ্রীক গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এ কারণে প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থে 'শেলীখা' শব্দটি দেখতে পাবেন।

আর এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রাচীন মুদ্রা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার বস্তু, এগুলোর মাধ্যমে বড় বড় ঐতিহাসিক রহস্য ও তত্ত্ব-তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু এরূপ প্রাচীন গ্রন্থাবলী, যা ক্রমাগতভাবে প্রত্যেক শতাব্দীর কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এসেছে এবং বড় বড় বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়েছে এবং এখনও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলোর মূল্য ও মর্যাদা সেসব মুদ্রা ও ফলকের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। কেননা ফলক ও মুদ্রায় জালিয়াতিরও সুযোগ-সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই জ্ঞানমূলক পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী, যা (প্রণয়নের) সূচনা কাল থেকেই কোটি কোটি লোকের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে এবং প্রত্যেক জাতি সেগুলোর সংরক্ষণ করেছে এবং এখনও করছে সেগুলোর লেখা ও বক্তব্য নিঃসন্দেহে এমন উচ্চ পর্যায়ের সাক্ষ্যস্বরূপ যে, এগুলোর সাথে মুদ্রা বা ফলকের কোন তুলনাই হয় না। সম্ভব হলে এমন কোন মুদ্রা বা ফলকের নাম বলুন যা বু'আলী সিনার আল্ কানূন গ্রন্থের ন্যায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। মোট কথা, সত্যান্বেষীদের জন্যে মারহাম-এ -ঈসা (নামক মলম) এক মহান সাক্ষ্য বিশেষ। এ সাক্ষ্যটি গ্রহণ ও স্বীকার না করা হলে জগদ্ব্যাপী ঐতিহাসিক সকল সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা যেসব গ্রন্থে মারহাম-এ-ঈসা-এর উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে, আজ পর্যন্ত সেগুলো যদিও সংখ্যায় এক হাজার বরং এর চেয়েও বেশি; কিন্তু এসব গ্রন্থ এবং এগুলোর প্রণেতাগণ কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। এমন সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ও শক্তিশালী সাক্ষ্য ও তথ্য-প্রমাণকে কেউ অস্বীকার করলে সে ইতিহাসলব্ধ প্রকাশ্য জ্ঞানের পরম শত্রু বলে প্রতীয়মান হবে। সে কি এত বিরাট, এত মহান সাক্ষ্য-প্রমাণকে উপেক্ষা করতে পারে? আমরা কি এমন ভারি ও শক্তিশালী প্রমাণ

দাশলিখা, মারহাম-উল-হাওয়ারিয়ীন এবং মারহাম -উর- রসূল নামেও পরিচিত। যার মধ্যে বার জন শিষ্যের সাথে সম্পর্কিত বারোটি উপাদান বিদ্যমান। (প্রকাশক-কাদিয়ান)

সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারি যা সারা ইউরোপ ও এশিয়া ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান, মাজুসী ও মুসলমানদের নামকরা দার্শনিকদের যৌথ সাক্ষ্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে?

এখন, হে সুহৃদ-সচ্চেতা গবেষকগণ! এ মহান প্রমাণটির দিকে ধাবিত হোন। হে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ! এ বিষয়টিতে একটু মনোনিবেশ করুন। এমন উজ্জ্বল সাক্ষ্য-প্রমাণ কি উপেক্ষা করার যোগ্য? সত্যের এ 'সূর্য' থেকে আলো আহরণ না করা কি সমীচীন? পক্ষান্তরে এমন ধারণার উদ্রেক সম্পূর্ণ অহেতুক ও উদ্ভট যে, হযরত ঈসা হয়তো তাঁর নবুয়ত কালের পূর্বে আহত হয়েছিলেন অথবা নবুয়ত কালেই আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু সে আঘাত ক্রুশের নয়, বরং অন্য কোন কারণে তাঁর হাত এবং পা জখম হয়ে গিয়েছিল। যেমন, হয়তো তিনি কোন ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে থাকবেন। আর সেই আঘাতের জন্যে এ মলম প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ বাজে। কেননা হাওয়ারীগণ তাঁর নবুওয়তকালের পূর্বে ছিলেন না। অথচ এ মলমটির ক্ষেত্রে হাওয়ারীদের উল্লেখ রয়েছে। গ্রীক ভাষায় 'শেলীখা' শব্দটি, যার অর্থ বার জন, এ সব গ্রন্থে এখনও বিদ্যমান। তাছাড়া নবুওয়তের পূর্বজীবনে হযরত মসীহ্র এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় নি যে, তাঁর কোন আঘাতের ঘটনা সংরক্ষিত হতো। তাঁর নবুওয়তকাল ছিল (ক্রুশীয় ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত) মাত্র সাড়ে তিন বছরের। আর এ সময়টিতে হযরত মসীহ্র ক্রুশে আহত হওয়া ছাড়া ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে অন্য কোন আঘাতের ঘটনা প্রমাণিত নয়। কেউ যদি ধারণা করে যে, হয়তো অন্য কোন কারণবশত হযরত মসীহ্ আঘাত পেয়ে থাকবেন তাহলে এর প্রমাণ পেশ করা তার দায়িত্ব। কেননা আমরা যে ঘটনাকে তুলে ধরছি তা এমন প্রমাণিত ও স্বীকৃত এক ঘটনা যা ইহুদীরাও অস্বীকার করে না এবং খ্রীষ্টানরাও করে না অর্থাৎ ক্রুশীয় ঘটনা। কিন্তু অন্য কোন কারণে হযরত মসীহ্র কোন আঘাত লেগে থাকতে পারে এমন ধারণা কোন জাতির ইতিহাসে প্রমাণিত নয়। কাজেই এমনটি মনে করা জেনে শুনে সত্যতার পথ পরিহার করা বৈ আর কিছু নয়। এ রকম বাজে ওজর-অজুহাতের দ্বারা খন্ডন হতে পারে এ তেমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নয়। বরং কিছু সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতাদের হাতে লেখা পান্ডুলিপি আজও বিদ্যমান। সুতরাং বু'আলী সিনার হস্ত লিখিত সংস্করণ আমার নিকটও মজুদ রয়েছে। অতএব এমন উজ্জ্বল প্রমাণকে হেলায় পরিহার

করা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকাশ্য অবিচার এবং সত্যতাকে হত্যা করার নামান্তর। এ বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন এবং ভালভাবে লক্ষ্য করুন, কী করে এ গ্রন্থাবলী আজও ইহুদী, মাজুসী, খ্রীষ্টান, আর ইরানী, গ্রীক, রোমান, ফ্রেঞ্চ ও জার্মানদের এবং ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থাগারে মজুদ রয়েছে! যে প্রমাণটির আলোকচ্ছটায় অস্বীকারের চোখ ঝল্‌সে যায় তা থেকে আমরা অহেতুক মুখ ফিরিয়ে নেবো-এ পর্যায়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে এমনটি করা কি শোভনীয়? এ কি এর যোগ্য? এসব গ্রন্থ যদি কেবল মুসলমান কর্তৃক রচিত হতো এবং কেবল মুসলমানদের হাতেই সীমিত থাকতো, তাহলে হয়তো কেউ ত্বরিৎ এ ধারণা করতে পারতো, মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মিছিমিছি এসব কথা বানিয়ে নিজেদের পুস্তকে লিখে দিয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সেসব কারণ ছাড়াও, যা আমি এখনই তুলে ধরবো এ কারণেও মুসলমানরা কখনও এমন জালিয়াতির আশ্রয় নিতে পারতো না বলে ভিত্তিহীন হতো যে, খ্রীষ্টানদের ন্যায় মুসলমানরাও বিশ্বাস করেন, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশের ঘটনার পরে পরেই আকাশে উঠে যান; মুসলমানরা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল বা ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন বলেই বিশ্বাস করে না। কাজেই তারা জেনে শুনে কী করে এমন জালিয়াতি করতে পারতো যা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসেরও বিরুদ্ধে যায়? তাছাড়া দুনিয়াতে তখন ইসলামের অস্তিত্বই ছিল না, যখন রোমান ও গ্রীক ইত্যাদি ভাষায় এমন গ্রন্থাদি প্রণীত হয় এবং কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি পায়, যে গ্রন্থগুলোতে 'মারহাম-এ-ঈসা'-এর ব্যবস্থাপত্র এ ব্যাখ্যাসহ মজুদ যে, এ মলমটি হাওয়ারীগণ হযরত ঈসার জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন। আর এ সকল জাতি অর্থাৎ ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলিম ও অগ্নি উপাসক ধর্মীয়ভাবে একে অপরের বিরোধী ছিল। তারা সবাই এ মলমটির উক্ত বিবরণ নিজেদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। কেবল তা-ই নয়, বরং তা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন নি। এতে প্রমাণিত হয়, এ মলমের ঘটনা এমন একটি বিষয় ছিল যা কোন সম্প্রদায় ও কোন জাতি অস্বীকার করতে পারে নি। তবে এটা সত্য যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব-কাল না আসা পর্যন্ত শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ও কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ এ মলম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্রটি থেকে

কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে সে দিকে এ সব জাতির কারোই দৃষ্টি যায় নি। অতএব এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, ক্রুশীয় বিশ্বাসের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে এক উজ্জ্বল ঝলমলে অস্ত্র ও সত্যের আলোকবর্তিকা হিসেবে এ সুস্পষ্ট প্রমাণটি আল্লাহ্‌তাআলার তকদীর অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদের মাধ্যমে জগতের সামনে প্রকাশিত হওয়া পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল। কেননা খোদাতাআলার পবিত্র নবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মসীহ্ মাওউদের দুনিয়াতে আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ক্রুশীয় ধর্ম ম্লান হবে না এবং এর উন্নতিও রুদ্ধ হবে না। একমাত্র তার হাতেই ক্রুশ ভঙ্গের কাজটি সংঘটিত হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে এ ইঙ্গিতই নিহিত ছিল যে, মসীহ্ মাওউদের সময়ে খোদার ইচ্ছায় এমন সব উপায়-উপকরণের উদ্ভব হবে যার মাধ্যমে ক্রুশীয় ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে। তখনই শেষ পরিণতি ঘটবে এবং এ আকীদা-বিশ্বাসের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে নয় বরং কেবল স্বর্গীয় উপায়-উপকরণের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও তত্ত্বোদ্ঘাটনের আকারে জগতে প্রকাশিত হবে। সহী বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হাদীসটির এ অর্থই বটে। অতএব দুনিয়াতে মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই আকাশ এ সকল সাক্ষ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের প্রকাশ ঘটতে দেবে না বলেই নির্ধারিত ছিল। সুতরাং ঘটনা তদ্রূপই ঘটেছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবের পর প্রত্যেক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে এবং চিন্তাশীল মানুষ বিষয়টিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে। কেননা খোদার মসীহ্ আবির্ভূত হয়েছেন। এখন অবশ্যই মানববুদ্ধিকে সুতীক্ষ্ণ করা হবে। তাদের অন্তরকে জাগ্রত করা হবে। লিখনীকে জোরদার করা হবে এবং বুকে সাহস সঞ্চার করা হবে। এখন প্রত্যেক সচ্চেতা ব্যক্তিকে বুঝবার শক্তি দেয়া হবে। প্রত্যেক সুশীল ব্যক্তিকে সুবোধ দেয়া হবে। কেননা আকাশে যা দীপ্ত হয় তা নিশ্চয় পৃথিবীকে আলোকিত করে। ধন্য সে ব্যক্তি, যে এ আলো থেকে অংশ লাভ করে। সৌভাগ্যবান সে-ই, যে এ জ্যোতির ভাগীদার হয়। যথাসময়ে আপনারা যেমন ফল ফলতে দেখতে পান, তেমনি জ্যোতিও নির্ধারিত সময়েই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। নিজে নিজে তা অবতীর্ণ হবার আগে কেউ একে অবতীর্ণ করতে সক্ষম নয়। আর যখন অবতীর্ণ হয় তখন একে কেউ রোধ করতে পারে না। মতভেদ ও বাকবিতন্ডা অবশ্য সংঘটিত হবে,

কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় অবধারিত। কেননা এ ব্যাপারটি মানবরচিত নয়, কোন আদম সন্তানের হাতে তৈরী নয়। বরং সেই খোদার তরফ থেকে প্রবর্তিত, যিনি ঋতুগুলোর পরিবর্তন ঘটান। সময়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন। দিন থেকে রাত এবং রাত থেকে দিন উদিত করেন। তিনি আঁধারও সৃষ্টি করেন, কিন্তু আলোকে ভালবাসেন। তিনি শির্ক তথা অংশীবাদিতাকেও ছড়াতে দেন, কিন্তু ভালবাসেন তৌহীদকেই। অন্য কেউ তাঁর জালাল ও প্রতাপের অধিকারী হোক তা তিনি চান না। মানব সৃষ্টিলগ্ন থেকে এর প্রলয় অবধি খোদাতাআলার প্রকৃতির বিধান এটাই যে, তিনি তৌহীদের সর্বদা সমর্থন করে থাকেন। যত নবী তিনি পাঠিয়েছেন, সবাই কেবল এজন্যেই এসেছিলেন, যাতে মানুষের এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনাকে দূর করে খোদাতাআলার আরাধনা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যে সেবা তাঁরা পৃথিবীতে প্রদান করে থাকেন তা হলো '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**' (আল্লাহ্তাআলা ছাড়া কোন উপাস্য নেই)-এর বিষয়বস্তু যেন ভূ-পৃষ্ঠে দীপ্তিমান হয়, যেমন তা আকাশে দীপ্ত রয়েছে। সুতরাং তাঁদের মাঝে সবার চেয়ে বড় তিনি, যিনি এ বিষয়টিকে অনেক দেদীপ্যমান করেছেন। যিনি প্রথমে বাতিল উপাস্যগুলোকে অন্তঃসারশূন্য সাব্যস্ত করেন এবং জ্ঞান ও ঐশী শক্তির ভিত্তিতে সেগুলোর তুচ্ছ হওয়া প্রতিপন্ন করেন। আর যখন সব কিছু প্রমাণ করে দেন, তখন তিনি তাঁর সেই চরম ও সুপ্রকাশমান বিজয়ের চিরস্থায়ী স্মৃতিফলকস্বরূপ রেখে যান **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল)। তিনি প্রমাণবিহীনভাবে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** (-এর কথা) বলেন নি। বরং তিনি প্রথমে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন এবং মিথ্যার সম্পূর্ণ খন্ডন পেশ করেন। তারপর মানুষকে এদিকে মনোযোগী করেন যে, দেখ! সেই খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই যিনি তোমাদের সমস্ত শক্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছেন এবং সমস্ত গর্ব ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। অতএব এ সপ্রমাণিত বিষয়টি স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ীভাবে এ আশিসপূর্ণ কলেমা শিখিয়েছেন ঃ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্।

চতুর্থ অধ্যায়

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ

এ অধ্যায়ে যেহেতু বিভিন্ন রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, সেহেতু এগুলোর প্রাঞ্জল ধারাবাহিকতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ যা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপক ভ্রমণ ও পর্যটনকে সাব্যস্ত করে

বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রওযাতুস্ সাফা'-এর ১৩০-১৩৫ পৃষ্ঠায় ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ বর্ণনাটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

'হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম 'মসীহ্' এজন্যে রাখা হয়েছে যে, তিনি অনেক 'সিয়াহত' তথা ভ্রমণ করতেন। তাঁর মাথায় পশমের একটি টুপি বা রুমাল ও গায়ে পশমের একটি কোট পরিধান করতেন এবং হাতে একটি লাঠি থাকতো। তিনি সর্বদা এক দেশ থেকে আরেক দেশ এবং এক শহর থেকে আরেক শহর ঘুরে বেড়াতেন। রাত নেমে এলে সেখানেই থেকে যেতেন। বনের শাক-সব্জি আহার করতেন ও বনের (ঝরণা ইত্যাদির) পানি পান করতেন এবং পদব্রজে ভ্রমণ করতেন। একবার ভ্রমণকালে তাঁর সাথীরা তাঁর জন্যে একটি ঘোড়া কিনলেন। এতে চড়ে তিনি এক দিন সফর করলেন। কিন্তু এর খাওয়া-খাদ্যের ব্যবস্থা করতে না পারায় তিনি তা ফেরৎ দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর দেশ (ফিলিস্তিন) থেকে যাত্রা করে কয়েক শ' মাইল দূরবর্তী শহর নাসিবাইনে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন হাওয়ারীও ছিলেন। হাওয়ারীদেরকে তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে শহরে পাঠালেন। কিন্তু সেই শহরে

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মায়ের সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গুজব রটে থাকার দরুন সে শহরের শাসক তাঁর শিষ্যদেরকে গ্রেফতার করলো। এরপর হযরত ঈসাকে ডেকে পাঠালো। তিনি সেখানে কয়েকজন রোগীকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য করলেন এবং আরও কিছু অলৌকিক কান্ড (মু'জিযা) প্রদর্শন করলেন। সে কারণে নাসিবাইনের রাজা তার সেনাবাহিনী ও সেখানকার অধিবাসীসহ তাঁর প্রতি ঈমান আনলো। কুরআন শরীফে বর্ণিত 'মায়েদা' অবতীর্ণ হবার ঘটনাটিও তাঁর সে ভ্রমণকালেরই।''

এ হলো সংক্ষেপে 'রওযাতুস্ সাফা' গ্রন্থের ঐতিহাসিক বর্ননা। এ প্রসঙ্গে যদিও গ্রন্থকার বহু আজে-বাজে ও অযৌক্তিক অলৌকিক ক্রিয়া হযরত ঈসার প্রতি আরোপ করে বর্ণনা করেছেন; সেগুলোকে আমি আফসোসের সাথে প্রত্যাহার করছি এবং আমার এ পুস্তকটিকে এ সব মিথ্যা ও আজে-বাজে অতিশয়োক্তিমুক্ত রেখে এথেকে কেবল আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করছি। এটা সিদ্ধান্ত দেয় যে, হযরত মসীহ্ তাঁর ভ্রমণ পথে নাসিবাইন পৌঁছে ছিলেন। নাসিবাইন হচ্ছে মসুল এবং সিরিয়ার মাঝে অবস্থিত একটি শহর। এটা ইংরেজী মানচিত্রে নাসিবাস (*Nasibus*) নামে পরিচিত। আমরা সিরিয়া থেকে পারস্যের দিকে যদি যাত্রা করি তাহলে আমাদের পথে নাসিবাইন শহরটি আসবে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রায় সাড়ে চার শ' মাইল দূরে অবস্থিত। আর নাসিবাইন থেকে মসুল প্রায় আটচল্লিশ মাইল দূরে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে পাঁচ শ' মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত আর মসুল থেকে পারস্য সীমান্ত কেবল এক শ' মাইলের দূরত্বে থেকে যায়। এ হিসেবে নাসিবাইন পারস্য সীমান্ত থেকে দেড় শ' মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এবং পারস্যের পূর্ব-সীমান্ত আফগানিস্তানের শহর হারাতে গিয়ে লাগে, অর্থাৎ পারস্যের দিকে হারাত আফগানিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এবং পারস্যের পশ্চিম-সীমান্ত থেকে খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত পাঁচ শ' মাইলের দূরত্ব। এভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে খাইবার গিরিপথ প্রায় নয় শ' মাইলের দূরত্ব। এ মানচিত্রটি দেখুন।

হযরত মসীহ্ (আ.)-এর ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ-পথ সংক্রান্ত নকশা

যেসব দেশ, শহর ও পথ অতিক্রম করে হযরত মসীহ্ (আ.) কাশ্মীর পৌঁছেছেন, এ নকশাটিতে তা দেখানো হয়েছে। এই ভ্রমণের পেছনে মূলত হযরত ঈসা (আ.)-এর উদ্দেশ্যে ছিল, যাতে তিনি সে সব বনী ইস্রাঈলের সাথে মিলিত হন যাদেরকে সম্রাট শালমেনসার* বন্দি করে মেডিয়া নিয়ে যায়। স্মরণ রাখা আবশ্যক, খ্রীষ্টানদের প্রকাশিত মানচিত্রে মেডিয়াকে 'খিযার' (এযোভ) উপসাগরের দক্ষিণ দিকে দেখানো হয়েছে, যেখানে আজ পারস্যদেশ অবস্থিত। এথেকে আমরা বুঝতে পারি, মেডিয়া অন্তত সেই দেশের একটি অংশ ছিল, যা আজ পারস্য নামে অভিহিত। পারস্যের পূর্ব-সীমান্ত আফগানিস্তানের সাথে মেলে। এর দক্ষিণে রয়েছে সমুদ্র এবং পশ্চিমে 'রোম' (তুরস্ক)। মোট কথা, 'রওযাতুস্ সাফা'য় বর্ণিত বিষয় সঠিক বলে ধরা হলে প্রতীয়মান হয় যে, নাসিবাইনের দিকে হযরত মসীহ্র ভ্রমণের এ উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তিনি পারস্যের পথে আফগানিস্তান যান এবং (সেখানে) সেই হারানো ইহুদীদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে পারেন, পরিশেষে যারা আফগান নামে খ্যাত হয়। আফগান নামটি বস্তুত ইব্রানী (হিব্রু) ভাষার শব্দ বলে প্রতীয়মান হয়। এটি একটি যুক্ত শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বীর বা সাহসী। মনে হয়, তারা তাদের বিজয়াদি অর্জনের সময় এ নামটি নিজেদের জন্য ধারণ করে।**

** পাদটীকা ঃ গ্রীসে ইউসিবিউস খৃষ্টানদের ইতিহাস গ্রন্থটি লন্ডনবাসী হিয়েনমার (Heinmer) ১৬৫০ ইং সালে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এর প্রথম অধ্যায়ের ১৪তম পরিচ্ছেদে একটি চিঠি লিপিবদ্ধ আছে। এতে জানা যায়, 'এব্গেরাস' নামী এক রাজা ফুরাত নদীর ওপার থেকে হযরত ঈসাকে (আঃ) নিজের কাছে ডেকে পাঠিয়েছিল। হযরত ঈসার নামে এবগেরাসের সেই পাঠানো চিঠি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর উত্তরটিতে অনেক মিথ্যা ও অতিশয়োক্তি ভরে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে এটুকু সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, সেই রাজা ইহুদীদের জুলুম-অত্যাচার সম্বন্ধে অবহিত হয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়ার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং খুব সম্ভব সে বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি একজন সত্য নবী। - গ্রন্থকার*

*** পাদটীকা ঃ তওরাতে বনী ইস্রাঈলের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তারা যদি আখেরী নবী (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে, তাহলে শেষ যুগে বহু দুঃখ-কষ্টের*

মোট কথা, হযরত ঈসা (আঃ) আফগানিস্তান হয়ে পাঞ্জাবের দিকে এ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, যাতে পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তান দেখার পর কাশ্মীরের দিকে এগোতে পারেন। লক্ষণীয় যে, চিত্রল ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ কাশ্মীরকে আফগানিস্তান থেকে পৃথক করেছে। তিনি যদি আফগানিস্তান থেকে পাঞ্জাবের পথ দিয়ে কাশ্মীরে যান, তাহলে প্রায় আশি ক্রোশ অর্থাৎ ১৩০ মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করতে হয়, আর চিত্রলের পথ দিয়ে গেলে একশ' ক্রোশ ব্যবধান হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) বিচক্ষণতার সাথে আফগানিস্তানের পথ অবলম্বন করেন যাতে আফগান নামে পরিচিত ইস্রাঈলের হারানো মেষ তথা গোত্রগুলো তাঁর কাছে কল্যাণমন্ডিত হয়। আর যেহেতু কাশ্মীরের পূর্ব-সীমান্ত তিব্বত সংলগ্ন, কাজেই কাশ্মীর এসে তিনি সেখান থেকে সহজেই তিব্বতও যেতে পারতেন এবং কাশ্মীর ও তিব্বত যাবার পূর্বে পাঞ্জাব হয়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান দেখে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সুতরাং এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলী সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, খুব সম্ভব হযরত মসীহ্ নেপাল, বেনারস ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। এরপর তিনি জম্মু অথবা রাওয়ালপিন্ডির পথে কাশ্মীরের দিকে গিয়েছিলেন। তিনি যেহেতু এক শীত প্রধান দেশের বাসিন্দা ছিলেন, সেহেতু এসব অঞ্চলে যথাসম্ভব তিনি কেবল শীতকাল পর্যন্তই অবস্থান করে থাকবেন এবং মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের শুরুতে কাশ্মীরের দিকে রওনা হয়ে থাকবেন। আর এ দেশটি (কাশ্মীর) যেহেতু হুবুহু সিরিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, সেহেতু এ-ও সুনিশ্চিত যে, এ দেশেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। তবে এ-ও সম্ভব যে, তাঁর জীবনের কিছু অংশ আফগানিস্তানেও কাটিয়েছেন এবং সেখানে খুব সম্ভব বিয়েও করে থাকবেন। আফগানদের মাঝে 'ঈসা খায়ল' নামে একটি গোত্র রয়েছে। তারা যদি তাঁরই অধঃস্তন বংশধর হয়ে থাকে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আফসোস, আফগানদের ইতিহাস খুবই এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। সে কারণে গৌত্রীয় জনশ্রুতির মাধ্যমে কোন

পাদটীকার শেষাংশ ঃ পর অবশেষে তাদেরকে পুনরায় রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা দান করা হবে। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতি এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, বনী ইস্রাঈলের দশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। সে কারণেই আফগানদের এবং কাশ্মীরিদের মাঝেও বড় বড় বাদশাহ্ হয়েছেন। - গ্রন্থকার

বাস্তব (অকাট্য) সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবুও এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আফগানরা বনী ইস্রাঈল, যেমন কাশ্মীরীরাও বনী ইস্রাঈলের অন্তর্ভূক্ত। যারা নিজেদের রচিত বই-পুস্তকে এর বিরুদ্ধে লিখেছেন তারা ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। তারা যথাযথ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেন নি। আফগানরা নিজেদেরকে কায়সের বংশধর বলে মানে। আর কায়েস হলেন বনী ইস্রাঈলের অন্তর্ভূক্ত। তবে এ স্থলে বিতর্কটিকে আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে আমি আমার এক পুস্তকে সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করে এসেছি। এস্থলে কেবল হযরত মসীহ্র সেই ভ্রমণই আলোচ্য বিষয়, যা তিনি নাসিবাইনের পথে আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব হয়ে কাশ্মীর ও তিব্বত পর্যন্ত করেছিলেন। এ সুদীর্ঘ ভ্রমণের কারণেই তাঁকে 'সাইয়াহ্ (পর্যটক) নবী' বরং 'পর্যটকদের সরদার' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং একজন সুবিখ্যাত মর্যাদাশালী মুসলিম পন্ডিত ও তত্ত্বদর্শী ইমাম আল্লামা আবূ বকর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ আল্ ফাহরি আল্ তারতূশী আলমালেকী তাঁর প্রণীত 'সিরাজুল মুলূক', যা ১৩০৬ হিঃ সালে মিশরের 'খাইরিয়া' ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছে এ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে লিখেছেনঃ

ابن عیسٰی روح اللّٰہ و کلمتہ رأس الزاھدین و امام السائحین

- অর্থাৎ রূহুল্লাহ্ ও কালেমাতুল্লাহ্ ঈসা, যিনি খোদাভীরুদের সরদার এবং পর্যটনকারীদের ইমাম ছিলেন, তিনি কোথায়? অর্থাৎ তিনিও মারা গেছেন। হায়! এহেন ব্যক্তিও জীবিত রইলেন না।' লক্ষ্য করুন, এখানে এ মহান আলেম হযরত ঈসাকে কেবল পর্যটক বলেন নি, বরং পর্যটকদের ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তেমনি 'লিসানুল আরাব' গ্রন্থের ৪৩১ পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ

قیل سُمِّیَ عیسٰی بمسیح لانَّہُ کان سائحًا فی الارض لا یستقرّ

অর্থাৎ 'ঈসা (আঃ)-কে মসীহ্ নামে এজন্যে অভিহিত করা হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে থাকতেন এবং কোথাও স্থায়ীভাবে অবস্থান করতেন

না।" 'তাজুল উরূস শারহে কামূসে'ও 'মসীহ্' নামের এ তাৎপর্যই লেখা আছে। আর এ-ও লেখা আছে যে, কল্যাণ ও আশিসের দ্বারা যাকে 'মাসাহ্' (অর্থাৎ স্পর্শ) করা হয় সে 'মসীহ্' হয়ে থাকে, অর্থাৎ যার প্রকৃতি ও স্বভাবে কল্যাণ নিহিত করা হয়। এমন কি তার স্পর্শও কল্যাণ ও আশিসের কারণ হয়ে যায়। এ নামটি হযরত ঈসাকে দান করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্তাআলা যাকে চান এ নামটি দান করে থাকেন। এর বিপরীতে সে-ও এক 'মসীহ্' যাকে অকল্যাণ ও অভিশাপের দ্বারা 'মাসাহ্' (স্পর্শ) করা হয়েছে। অর্থাৎ যার প্রকৃতি ও স্বভাবে অকল্যাণ ও অভিশাপ নিহিত করা হয়েছে। এমন কি, তার ছোঁয়াতেও অকল্যাণ, পথভ্রষ্টতা ও অভিশাপের সঞ্চার হয়। আর এ নামটি 'মাসীহুদ-দাজ্জাল'-কে দেয়া হয়েছে। তেমনি দাজ্জালের সমমনা ও স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি এ নামে অভিহিত হয়। পর্যটক মসীহ্ ও কল্যাণমন্ডিত মসীহ্ এ দুটি নামের একটি অপরটির পরিপন্থী নয়। এর প্রথম অর্থ অপরটিকে বাতিল করতে পারে না। কেননা খোদাতাআলার এ-ও একটি বিধান যে, তিনি একটি নাম কোন ব্যক্তিকে দান করে থাকেন এবং সেটি একাধিক অর্থ বহন করে। আর এ সব অর্থই তার ওপর প্রযোজ্য হয়। মোদ্দা কথা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর 'সাইয়াহ্' তথা পর্যটক হওয়ার বিষয়টি ইসলামী ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে এমন একটি প্রমাণিত বিষয় যে, সেই গ্রন্থগুলো থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরতে গেলে, আমার ধারণা, এ প্রবন্ধটি দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুন এক বিরাটকায় গ্রন্থে পরিণত হতে পারে। অতএব এতটুকু যথেষ্ট বলে মনে করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ

জানা আবশ্যক, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলী থেকে বহুবিধ তথ্য-প্রমাণ আমার হস্তগত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে সুনিশ্চিত জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) অবশ্যই পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে এসেছিলেন। এ সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো আমি নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি, যাতে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এগুলো প্রথমে গভীর মনোনিবেশে পাঠ করেন। এরপর এগুলোকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করে তাঁরা নিজেরাই উল্লেখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে ঃ

প্রথমত গৌতম বুদ্ধ এবং হযরত ঈসাকে দেয়া উপাধিগুলো হুবুহু একই রকম। তেমনিভাবে তাদের উভয়ের জীবনের ঘটনাবলী পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে বৌদ্ধধর্ম বলতে তিব্বতের সীমারেখায় অর্থাৎ লেহ্, লাহ্সা, গিলগিত ও হাম্স ইত্যাদি অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মকে বোঝায়। এসব জায়গায় হযরত ঈসা (আঃ) গিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত। উপাধিগুলোতে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে এ প্রমাণই যথেষ্ট, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর শিক্ষায় নিজেকে নূর (জ্যোতিঃ) বলে অভিহিত করেছেন। তেমনি গৌতমকে 'বুদ্ধ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এ শব্দটির দ্বারা জ্যোতিঃ বোঝায়। ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি উপাধি হলো 'শিক্ষক'। তেমনি গৌতম বুদ্ধের একটি উপাধি হচ্ছে 'শাস্তা' বা শিক্ষক। যেভাবে ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্কে আশিসমন্ডিত বলা হয়েছে, তেমনি গৌতম বুদ্ধকেও 'সগ্ত' বা আশিসমন্ডিত বলা হয়েছে। আর যেমন হযরত মসীহ্কে শাহ্জাদা (যুবরাজ) বলে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি বুদ্ধকেও যুবরাজ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে এ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হবেন। তেমনি বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদিতে গৌতম বুদ্ধের একটি উপাধি হচ্ছে 'সিদ্ধার্থ' অর্থাৎ তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্কে 'ক্লান্ত-শ্রান্তদের আশ্রয়দাতা' বলা হয়েছে। তেমনি বৌদ্ধধর্মের

গ্রন্থাদিতে গৌতম বুদ্ধের একটি উপাধি হচ্ছে 'আশ্রণ সরণ' অর্থাৎ নিরাশ্রয়দেরকে আশ্রয়দানকারী। ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্ (আঃ) বাদশাহ্ বলেও অভিহিত হয়েছেন যদিও তিনি এর দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজত্বকে বুঝিয়েছেন। তেমনি গৌতম বুদ্ধকেও বাদশাহ্ বলা হয়েছে।

ঘটনাবলীতে সাদৃশ্যের প্রমাণ হচ্ছে, যেমন ইঞ্জিলে লেখা আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে শয়তান দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। শয়তান তাঁকে বলে, 'তুমি যদি আমাকে সিজদা কর তাহলে জগতের সমস্ত ধন-দৌলত ও রাজত্ব তোমার হয়ে যাবে।' অনুরূপ পরীক্ষা বুদ্ধেরও হয়েছে। শয়তান তাঁকে বলে, 'তুমি যদি আমার আদেশ মেনে তপস্যার জীবন ত্যাগ কর এবং গৃহে ফিরে যাও তাহলে তোমাকে রাজকীয় ঐশ্বর্য দেয়া হবে।' কিন্তু মসীহ্ যেমন শয়তানের আনুগত্য স্বীকার করেন নি। তেমনই লেখা আছে, গৌতম বুদ্ধও শয়তানের আনুগত্য স্বীকার করেন নি। দেখুন, টি. ডাবলিউ. রাইস ডেভিড্স প্রণীত বুড্ডিজম; মনিয়ের উইলিয়মস্ প্রণীত বুড্ডিজম।*

এতে স্পষ্টত জানা যায় যে, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্ (আঃ) নিজেকে যে সকল উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তাঁর অনেক পরে বৌদ্ধদের রচিত বই-পুস্তকে সে সব উপাধিতে গৌতম বুদ্ধকে ভূষিত করা হয়েছে। আর যেমন শয়তান কর্তৃক হযরত মসীহ্র পরীক্ষা হয়েছিল, তেমনি এসব বই-পুস্তকে শয়তান কর্তৃক গৌতম বুদ্ধের পরীক্ষা নেয়ার উল্লেখ রয়েছে। বরং এসব পুস্তকে বুদ্ধের বেশি পরীক্ষা হয়েছিল বলে বিবরণ রয়েছে। লেখা আছে, গৌতম বুদ্ধকে শয়তান ধন-দৌলত ও রাজত্বের প্রলোভন দিলে তাঁর মনে গৃহে ফিরে যাবার ধারণার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু তিনি এর অনুসরণ করেন নি। তখন আবারও শয়তান তার সকল পরিজন নিয়ে এক বিশেষ রাতে তাঁর নিকট আসে এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তাঁকে ভয় দেখায়। বুদ্ধ ওই শয়তানগুলোকে সাপের আকৃতিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, যারা মুখ দিয়ে বিষ এবং আগুন উদ্গীরণ করছিল; কিন্তু বিষ তাঁর কাছে এসে পুষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল এবং আগুন

** টীকা ঃ এডকিন্স (Edkins) প্রণীত 'চাইনিজ বুড্ডিজম(Chinese Buddhism); ওল্ডেন বার্গ (Oldenberg) প্রণীত 'বুদ্ধ' (Buddha) ডাবলিউ, হুই (W. Hoey) অনুদিত; 'লাইফ অব বুদ্ধ' (Life Of Buddha) রকহিল (Rockhill) অনুদিত।*

তার চারিদিকে বলয়ে রূপান্তরিত হচ্ছিল। এভাবেও শয়তান যখন সফল হতে পারলো না তখন সে তার ষোলজন কন্যাকে ডেকে বললো, 'তোমরা বুদ্ধের সামনে তোমাদের রূপ প্রকাশ কর।' কিন্তু এতেও তাঁর মনোবলে চিড় ধরে নি এবং শয়তান বিফল মনোরথ হয়। এরপর শয়তান আরো কিছু কৌশল অবলম্বন করে, কিন্তু তাতেও বুদ্ধের দৃঢ়তার মুখে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং গৌতম বুদ্ধ ক্রমান্বয়ে উন্নত স্তরসমূহ অতিক্রম করতে থাকেন। অবশেষে এক দীর্ঘ রাতের অবসানে অর্থাৎ কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষার পর তিনি তাঁর শত্রু অর্থাৎ শয়তানকে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁর নিকট প্রকৃত জ্ঞানের আলো প্রতিভাত হয় এবং প্রভাত উদিত হতেই অর্থাৎ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সত্যিকার জ্ঞান লাভ করেন। যে ভোরে সেই যুদ্ধের অবসান হয় সে ভোরটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের জন্মদিন। সে সময় গৌতমের বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। আর তখনই তাঁকে 'বুদ্ধ' অর্থাৎ 'নূর বা জ্যোতিঃ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়, এবং যে বৃক্ষের নিচে তিনি বসেন, সেটি নূর বা জ্ঞানের বৃক্ষ নামে খ্যাতি লাভ করে। এখন ইঞ্জিল পাঠ করে দেখুন, শয়তানের পরীক্ষায় বুদ্ধের সাথে মসীহ্‌র কত মিল ছিল। এমন কি, পরীক্ষার সময়ে মসীহ্‌র বয়স প্রায় বুদ্ধের সমান ছিল। বৌদ্ধ পুস্তকাবলীতে প্রমাণিত যে, শয়তান প্রকৃতপক্ষে মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের চোখের সামনে দিয়ে বুদ্ধের কাছে আসে নি, বরং তা কেবল বুদ্ধের দৃষ্টি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এক দৃশ্য ছিল এবং শয়তানের কথোপকথন ছিল শয়তানী ইলহাম অর্থাৎ শয়তান দৃশ্যমান হওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধের অন্তরে এ প্ররোচনাও দিচ্ছিল, এ পথ ছেড়ে তিনি যেন তার নির্দেশ মেনে চলেন। তাহলে সে তাঁকে জগতের সব ঐশ্বর্য দেবে। তেমনি খ্রীষ্টান গবেষকগণও স্বীকার করেন যে, শয়তান মানুষে মূর্ত হয়ে ওলি-গলি পেরিয়ে ইহুদীদের সম্মুখ দিয়ে হযরত মসীহ্‌র নিকট এসে তার সাথে মানুষের ন্যায় কথোপকথন করে নি যা উপস্থিত লোকেরাও শুনতো। বরং সে সাক্ষাতটি হযরত মসীহ্‌র দৃষ্টি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ দিব্যদর্শনমূলক এক সাক্ষাৎ ছিল এবং কথোপকথনও ইলহাম আকারে ছিল অর্থাৎ শয়তান চিরাচরিত নিয়মে তার ইচ্ছাকে হযরত মসীহ্‌র অন্তরে প্ররোচনার আকারে উদ্রেক করছিল। কিন্তু মসীহ্‌র অন্তর সেসব শয়তানী ইলহাম বা প্ররোচনাকে গ্রহণ করে নি, বরং গৌতমবুদ্ধের মত তিনিও সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, গৌতম বুদ্ধ এবং হযরত ঈসার মাঝে এত পারস্পরিক সাদৃশ্য কেন সৃষ্টি হলো। এ প্রসঙ্গে আর্যসমাজীরা বলেন, হযরত মসীহ্ হিন্দুস্তানে তাঁর ভ্রমণকালে বৌদ্ধধর্মের কথাগুলো শোনার এবং গৌতমবুদ্ধের জীবনের এ জাতীয় ঘটনাবলী জানার পর স্বদেশে ফিরে এসে তদনুযায়ী ইঞ্জিল তৈরী করে নিয়েছিলেন। তিনি গৌতমবুদ্ধের চারিত্রিক আদর্শকে চুরি করে ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষা রচনা করেছিলেন এবং বুদ্ধ যেভাবে নিজেকে জ্যোতিঃ ও জ্ঞান বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য উপাধিগুলো ধারণ করেছিলেন, তেমনি মসীহ্ও সেসব উপাধি নিজের দিকে আরোপ করেন। শুধু তাই নয়, বরং শয়তান কর্তৃক বুদ্ধের পরীক্ষা সংক্রান্ত গোটা ঘটনাকে হযরত মসীহ্ নিজের ঘটনা বলে চালিয়ে দেন। কিন্তু আর্য সমাজীদের এসব মস্ত ভুল এবং সত্যের অপলাপ বৈ কিছু নয়। এটা সম্পূর্ণ অসত্য যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশীয় ঘটনার পূর্বে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। সে সময়ে তাঁর ওরূপ কোন ভ্রমণের প্রয়োজনই দেখা দেয় নি। বরং এর প্রয়োজন কেবল তখনই হয়েছিল যখন সিরিয়ার ইহুদীরা হযরত মসীহ্কে গ্রহণ করলো না, বরং ক্রুশবিদ্ধ করে তারা তাঁকে বধ করেছে বলে বিশ্বাস পোষণ করলো, অথচ আল্লাহ্ সূক্ষ্ম কৌশলে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তখন হযরত মসীহ্ (আঃ) সে দেশের ইহুদীদের প্রতি তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ও তবলীগের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন। আর ইহুদীদের হৃদয় যখন তাদের জঘন্য সে অপকর্মের কারণে কঠোর হয়ে গেল এবং তারা সত্য গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়লো, সে সময় হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হারানো দশ গোত্র সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে যে, তারা হিন্দুস্তানের দিকে চলে এসেছিল, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে এ দেশের সেসব অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হলেন। আর এ সকল ইহুদীর একাংশ যেহেতু বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু এই সত্য নবীর পক্ষে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের দিকে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

অতএব সেই সময় একজন 'বুদ্ধ মসীহ্'-এর জন্যে অপেক্ষমান বৌদ্ধধর্মের পন্ডিতরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপাধিসমূহ সহ তাঁর কোন কোন নৈতিক শিক্ষা যেমন- 'শত্রুকে ভালবেসো এবং অনিষ্টের প্রতিরোধ করো না' আর সেই সাথে গৌতমবুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত আলামত অনুযায়ী

হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর 'বাগওয়া' অর্থাৎ গৌর বর্ণ লক্ষ্য করে তাঁকে বুদ্ধ বলে নির্ধারণ করার সুযোগ পেলো। খুবসম্ভব সে যুগেই হযরত মসীহ্র জীবনের কিছু ঘটনা ও তাঁর শিক্ষা গৌতমবুদ্ধের দিকে জেনে শুনে কিংবা ভুলবশত আরোপ করা হয়েছে। কেননা হিন্দুরা সর্বদা ইতিহাস রচনায় অপরিপক্কতার স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। তাছাড়া গৌতমবুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর সময়কাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধও হয় নি। কাজেই বৌদ্ধ পুরোহিতদের পক্ষে যদেচ্ছা বুদ্ধের প্রতি আরোপ করে দেয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। অতএব খুবসম্ভব, তারা হযরত মসীহ্র জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁর নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এ বিষয়গুলোকে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে এতে আরও কিছু মিশিয়ে তা গৌতম বুদ্ধের দিকে আরোপ করে থাকবেন।*

সুতরাং পরবর্তীতে আমরা এর প্রমাণ উপস্থাপন করবো যে, বৌদ্ধ ধর্মের পুস্তকাবলীতে নৈতিক শিক্ষার যেসব অংশ ইঞ্জিল অনুযায়ী পাওয়া যায় এবং জ্যোতিঃ ইত্যাদি যেসব উপাধি হযরত মসীহ্র ন্যায় গৌতম বুদ্ধের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ বলে প্রমাণিত, আর তেমনি শয়তানের পরীক্ষা - এসব বিষয় সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের পুস্তকাবলীতে লেখা হয়েছিল যখন হযরত মসীহ্ ক্রুশীয় বিপর্যয়ের পর এদেশে এসেছিলেন।

হযরত মসীহ্র সাথে গৌতম বুদ্ধের আরও একটি সাদৃশ্য রয়েছে যেমন বৌদ্ধ পুস্তকাবলীতে লেখা আছে, শয়তান কর্তৃক পরীক্ষার দিনগুলোতে বুদ্ধ রোযা রাখতেন। তিনি চল্লিশ দিন রোযা রেখেছিলেন। ইঞ্জিলের পাঠকগণ জানেন যে, হযরত মসীহ্ও চল্লিশটি রোযা রেখেছিলেন।

এই মাত্র আমি যেমন বর্ণনা করে এসেছি, বুদ্ধ ও মসীহ্র নৈতিক

** পাদ-টীকা ঃ প্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধধর্মে যে নৈতিক শিক্ষার এক বিরাট অংশ বিদ্যমান চলে আসছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ-ও বলি, এর যে- সব অংশ ইঞ্জিলের শিক্ষা, ইঞ্জিলের উপমা ও দৃষ্টান্ত এবং ইঞ্জিলের ভাষ্য অনুযায়ী হুবহু রয়েছে, সেসব অংশ নিঃসন্দেহে সেই সময়েই বৌদ্ধ ধর্মের পুস্তকাবলীতে সংযোজন করা হয়েছে, যখন হযরত মসীহ্ এদেশে পৌঁছেছিলেন। - গ্রন্থকার*

শিক্ষায় যে এতো বেশি মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে তা লক্ষ্য করে উভয় শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত ব্যক্তি মাত্রই বিস্ময়াবাক হয়ে পড়বে। যেমন, ইঞ্জিলগুলোতে লেখা আছে, 'অনিষ্টের প্রতিরোধ করো না। শত্রুকে ভালবাস। দীনতার সাথে জীবন-যাপন কর। অহংকার, মিথ্যা ও লোভ পরিহার কর।' এ শিক্ষাই গৌতম বুদ্ধেরও। বরং এতে তার চেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে, এমন কি প্রত্যেক জীব হত্যা বরং কীট-পতঙ্গের রক্তপাতকেও পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। বুদ্ধের শিক্ষায় মোক্ষম কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, 'পৃথিবীর সকলের জন্যই দুঃখ-মোচনকারী ও সহানুভূতিশীল হও। সকল মানুষ ও জীবের কল্যাণ কামনা কর এবং নিজেদের মাঝে পরস্পর ভালোবাসা ও একতা সৃষ্টি কর।' ইঞ্জিলেরও একই শিক্ষা। আরও যেমন হযরত মসীহ্ বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে তাঁর শিষ্যদের পাঠান এবং নিজেও একটি দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, এসব বিষয়ও গৌতম বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্তে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং স্যার মোনিয়ের উইলিয়াম প্রণীত 'বুড্ডিজম' গ্রন্থে লেখা আছে, বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে পৃথিবীতে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, আর তাদেরকে এভাবে আহ্বান করেন ঃ 'তোমরা বেরিয়ে পড়, সব দিকে ছুটে যাও। জগদ্বাসীর প্রতি সহানুভূতি এবং দেবতা ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে একাকী ও বিভিন্নভাবে বেরিয়ে পড়। আর আহ্বান কর, 'প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হও। সন্ন্যাসবাদ অর্থাৎ একা ও চিরকুমার থাকার স্বভাব অবলম্বন কর।' আরও বলেন, 'আমি এ বিষয়ে আহ্বানের উদ্দেশ্যে বেরুচ্ছি।' বুদ্ধ বেনারসের দিকে গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক মু'জিযা দেখান। তিনি একটি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হিতোপদেশ প্রদান করেন, যেমন হযরত মসীহ্ও পাহাড়ে দাঁড়িয়ে হিতোপদেশ দান করেছিলেন। সে গ্রন্থটিতে আরও লেখা আছে, বুদ্ধ বেশির ভাগ সময় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপদেশ দান করতেন। বাহ্যিক জিনিস দিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী তাদের কাছে তুলে ধরতেন।

এখন ভেবে দেখা উচিত, এই নৈতিক শিক্ষা এবং এই উপদেশ ও প্রচারপদ্ধতি অর্থাৎ উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলা হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিজস্ব ভঙ্গী। যখন আমরা এ প্রচার-পদ্ধতি ও নৈতিক শিক্ষা আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখি, তখন সহসা আমাদের

হৃদয়ে এ কথারই উদ্রেক হয় যে, এ সবই হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর শিক্ষার অনুলিপি। যখন তিনি এ দেশে (ভারতবর্ষে) আসেন এবং সর্বত্র উপদেশও প্রদান করেন তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং তাঁকে একজন ঐশী-কল্যাণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে পেয়ে তারা তাদের বই-পুস্তকে তাঁর এসব কথা লিপিবদ্ধ করে নেয়, বরং তাঁকে 'বুদ্ধ' বলে ঘোষণা করে। কেননা এটা মানবস্বভাব, যেখানেই সে কোন উত্তম বিষয় দেখতে পায় সেখান থেকে সে তা যেভাবে হোক কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। এমন কি, কোন আলোচনা-বৈঠকে যদি কোন উত্তম তত্ত্ব-কথা কারও মুখ দিয়ে বের হয় তাহলে অপরে তা স্মরণ রাখে। অতএব খুব সম্ভব, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ ইঞ্জিলের অবিকল ছবি তাদের গ্রন্থাবলীতে এঁকে দিয়েছেন। যেমন মসীহ্ চল্লিশ দিন রোযা রাখেন, তেমনি বুদ্ধও চল্লিশ দিন রোযা রাখেন, আর শয়তান কর্তৃক যেমন মসীহ্র পরীক্ষা হয়, তেমনি বুদ্ধেরও হয়। আর মসীহ্ যেমন বিনা পিতায় জন্মলাভ করেন, তেমনি বুদ্ধও বিনা পিতায় জন্মলাভ করেন। আরও যেমন মসীহ্ বলেন যে, তিনি নূর (জ্যোতিঃ), তেমনি বুদ্ধও বলেন। আর মসীহ্ যেমন নিজেকে শিক্ষক এবং তাঁর হাওয়ারীদেরকে শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি বুদ্ধও নিজেকে শিক্ষক এবং তাঁর অনুচরদেরকে শিষ্য বলে আখ্যায়িত করেন। আরও যেমন মথি লিখিত ইঞ্জিলের অধ্যায় ১০ এর ৮ ও ৯ শ্লোকে লেখা আছে ঃ 'সোনা চাঁদি ও তামা নিজেদের কাছে রেখো না' তেমনি বুদ্ধও এ আদেশই তাঁর শিষ্যদেরকে দান করেন। আর যেমন ইঞ্জিলে কৌমার্যের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তেমনি বুদ্ধের শিক্ষায়ও এর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আর যেমন মসীহ্কে ক্রুশ-বিদ্ধ করার পর ভূমিকম্প হয়েছিল তেমনি লেখা আছে যে, বুদ্ধ মারা গেলে ভূমিকম্প হয়েছিল।* এই যাবতীয় সাদৃশ্যের মূল কারণ কেবল এটাই যে, বৌদ্ধদের সৌভাগ্যক্রমে হযরত মসীহ্ ভারতবর্ষে আসেন এবং এক দীর্ঘকাল ব্যাপী বৌদ্ধদের মাঝে জীবন যাপন করেন। ফলে তারা তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর পবিত্র শিক্ষা সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত হয়। অতএব এ শিক্ষা ও আচারাদির বড় একটা অংশ তাদের মাঝে প্রচলিত হয়ে পড়াই

** নোট ঃ খৃষ্টানদের মাঝে যেমন 'ইশা রব্বানী' রয়েছে, তেমনি বৌদ্ধদের মাঝেও বিদ্যমান।*

আবশ্যক ছিল। কেননা তাদের দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ অতি সম্মানের পাত্র হিসেবে গৃহীত এবং 'বুদ্ধ' বলে চিহ্নিত হন। কাজেই তারা তাঁর কথাগুলোকে তাদের পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ করে এবং গৌতম বুদ্ধের দিকে আরোপ করে।

এটা অতি বিস্ময়কর ঘটনা যে, বুদ্ধ হুবহু মসীহ্র ন্যায় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশেষত ইঞ্জিলে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলোর মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দান করেন। সেসব দৃষ্টান্তে বুদ্ধ বলেন ঃ 'কৃষক যেমন বীজ বপন করে কিন্তু বলতে পারে না যে, তা আজ ফুলবে এবং কাল ফলবে। শিষ্যের অবস্থা এমনটিই হয়ে থাকে অর্থাৎ তার বেড়ে ওঠা উত্তম হবে, না কি সেই বীজের ন্যায় হবে যা পাথরযুক্ত মাটিতে বপন করা হয়, আর শুকিয়ে যায়?" দেখুন, হুবহু এ দৃষ্টান্তটিই ইঞ্জিলে এখনও মজুদ রয়েছে। বুদ্ধ আবার আরেকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন ঃ 'এক পাল হরিণ জঙ্গলে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে প্রতারণা করে এদের জন্যে এমন পথ খুলে দেয়, যা এদের জন্যে মরণ ফাঁদ হয়ে থাকে, অর্থাৎ সে চেষ্টা করে এরা যেন এমন পথে পরিচালিত হয় যাতে অবশেষে এরা ফাঁদে পড়ে এবং মৃত্যুর শিকার হয়। পক্ষান্তরে আরেক ব্যক্তি আসে। সে ভাল পথের সন্ধান দেয়। অর্থাৎ সে ক্ষেত বপন করে যাতে সেখানে এরা চরে খায়। সে খাল কেটে আনে, যাতে এথেকে এরা পানি পান করে এবং এদের অবস্থা ভাল হয়ে ওঠে। মানুষের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তারা যখন সচ্ছল অবস্থায় থাকে, তখন সহসা শয়তান আসে এবং তাদের জন্যে পাপের অষ্টমুখী পথ খুলে দেয় যাতে এরা ধ্বংস হয়ে যায়। তখন পূর্ণমানব আসেন এবং এদের জন্যে সত্য ও দৃঢ়বিশ্বাস এবং শান্তির অষ্টমুখী পথ খুলে দেন যাতে এরা রক্ষা পায়।' বুদ্ধের শিক্ষায় এ-ও রয়েছে ঃ "সত্যপরায়ণতা এমন এক সুরক্ষিত ভান্ডার যা কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না। বস্তুত তা এমন এক রত্নভান্ডার যা মৃত্যুর পরেও মানুষের সঙ্গে যায়। তা এমন এক ধন-ভান্ডার যে, এর পুঁজির মাধ্যমে সকল জ্ঞান ও পরিপূর্ণতার সৃষ্টি হয়।" এখন লক্ষ্য করুন, এগুলো হুবহু ইঞ্জিলের শিক্ষা। এসব কথা বৌদ্ধধর্মের সেইসব প্রাচীন পুস্তকে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়, যেগুলো হযরত মসীহ্র সময়কাল থেকে বেশি দূরবর্তী সময়ের নয়, বরং সে সময়কারই বটে। আবার এ গ্রন্থেরই ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ "বুদ্ধ বলেন, 'আমি এমন ব্যক্তিত্ব যে, কেউ আমাকে দোষ দিতে পারে না।" এ বাক্যটি

হযরত মসীহ্র উক্তির সঙ্গে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ। 'বুড্ডিজম' পুস্তকটির ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ "গৌতম বুদ্ধের এবং খৃষ্টানদের নৈতিক শিক্ষার মাঝে অসাধারণ সাদৃশ্য বিদ্যমান।" আমি একথা স্বীকার করি। বরং আমি স্বীকার করি যে, এ উভয়েই আমাদের বলেন, 'দুনিয়াকে ভালবেসো না, ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ো না। শত্রুদের প্রতি শত্রুতা করো না। মন্দ ও অপবিত্র কাজ করো না। পাপকে পুণ্যের দ্বারা জয় কর। অন্যদের সাথে সেই ব্যবহার কর যা তোমরা তাদের পক্ষ থেকে নিজের জন্যে আশা কর।

এতে প্রতীয়মান হয়, ইঞ্জিল এবং বুদ্ধের শিক্ষায় এত বেশি সাদৃশ্য রয়েছে যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাবলী থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, গৌতমবুদ্ধ আগমনকারী আরেক বুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার নাম 'মত্তিয়া' হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি বুদ্ধের 'লাক্কাওতি সুতাতা'(*Laggavatti Suttatta*) নামের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ওল্ডেনবার্গ প্রণীত 'বুদ্ধা' (*Buddha by Dr. Herman Oldenberg*) গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষ্য হলো ঃ

"মত্তিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নেতা হবে, যেমন আমি এখন সহস্র সহস্র মানুষের নেতা রয়েছি।"

এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, যে শব্দটি ইব্রানী ভাষায় 'মাসীহা' সেটিই পালী ভাষায়, 'মুত্তিয়া' করে (উচ্চারণে) বলা হয়েছে। এতো এক সাধারণ নিয়মের কথা যে, একটি ভাষার শব্দ যখন অন্য ভাষায় যায়, তখন এতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে থাকে। সুতরাং ইংরেজী শব্দও অন্য ভাষায় গিয়ে বদলে যায়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাক্সমূলার সাহেব এর একটি ফিরিস্তি 'সেক্রেড বুক্স অব দি ইস্ট' (*Sacred Books of the East*) গ্রন্থের ১১তম খন্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠায় তুলে দিয়ে লিখেছেন ঃ 'টি এইচ (*Th*) অক্ষর, যা ইংরেজী ভাষায় থ-এর উচ্চারণ দেয়, তা ফার্সী ও আরবী ভাষায় 'স' (S) এর উচ্চারণ দেয়। অতএব এসব পরিবর্তন দৃষ্টিপটে রেখে প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, 'মাসীহা' শব্দটি পালী ভাষায় গিয়ে 'মত্তিয়া' হয়েছে। যে আগমনকারী 'মত্তিয়া' সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি হলেন প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্। অন্য

কেউ নয়। এ কথার স্বপক্ষে অতি পুক্তো দলিল হচ্ছে, গৌতম বুদ্ধ এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, তিনি নিজে যে ধর্মের ভিত্তি রেখেছেন তা ভূ-পৃষ্ঠে পাঁচ শ' বছরের বেশি টিকে থাকবে না। আর তাঁর ধর্ম-শিক্ষা ও নীতির অধঃপতনের সময়ে 'মুত্তিয়া' এ দেশে (ভারতবর্ষে) আগমনপূর্বক এ সকল নৈতিক শিক্ষাকেই পৃথিবীতে পুনঃসংস্থাপন করবেন।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) গৌতম বুদ্ধের পাঁচ শ' বছর পরে আবির্ভূত হয়েছেন। এবং বুদ্ধ যেভাবে তাঁর ধর্মের অধঃপতনের সময়-সীমা নির্ধারণ করেছিলেন, সেভাবে সে সময়-সীমায় বৌদ্ধধর্ম অধঃপতনে উপনীত হয়েছিল। তখনই হযরত মসীহ্ ক্রুশীয় বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পেয়ে এ দেশের দিকে যাত্রা করেন এবং (তিনি এলে) বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ তাঁকে সনাক্ত করে অত্যন্ত সম্মান দেখায়। আর এতে কেউ কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, গৌতম বুদ্ধ যে সব নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক নিয়মনীতি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোকে হযরত মসীহ্র শিক্ষা ও নিয়ম-নীতি পুনরায় জগতে জন্ম দিয়েছে। খৃষ্টান ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়টি মানেন যে, ইঞ্জিলের বর্ণিত হযরত ঈসা কর্তৃক পাহাড়ে দেয়া উপদেশ-বাণী এবং অন্যান্য অংশে বা উপলক্ষ্যে নৈতিক বিষয়ে দেয়া শিক্ষা অবিকল সে শিক্ষাই বটে যা গৌতম বুদ্ধ হযরত মসীহ্র পাঁচশ' বছর পূর্বে দুনিয়ায় প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন। তাঁরা এ-ও বলেন যে, গৌতম বুদ্ধ কেবল নৈতিক শিক্ষার প্রবক্তাই ছিলেন না, বরং তিনি অন্যান্য আরো বড় বড় সত্যেরও প্রবক্তা ছিলেন। তাঁদের ধারণায় বুদ্ধকে যে এশিয়ার জ্যোতিঃ বলে অভিহিত করা হয়েছে তা যথার্থ। অতএব গৌতম বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর পাঁচশ' বছর পরে হযরত মসীহ্ আবির্ভূত হন এবং অধিকাংশ খৃষ্টান পন্ডিতদের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাঁর নৈতিক শিক্ষা হুবহু বুদ্ধের শিক্ষা ছিল। কাজেই এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি (মসীহ্) বুদ্ধের রঙে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং ওল্ডেনবার্গের গ্রন্থে গৌতমবুদ্ধের কিতাব 'লাক্কাওতি সুতাতা'-এর উদ্ধৃতি মূলে লেখা আছে ঃ 'গৌতমবুদ্ধের ভক্তগণ ভবিষ্যতকালের আশায় সর্বদা নিজেদেরকে আশ্বাস দিতেন যে, তারা 'মত্তিয়া'-এর শিষ্য হয়ে পরিত্রাণ লাভে কল্যাণমন্ডিত হবে, অর্থাৎ তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, 'মত্তিয়া' তাদের মাঝে আসবেন এবং তারা তাঁর মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করবে। কেননা

যে ভাষায় বুদ্ধ তাদেরকে 'মত্তিয়া'-এর আশ্বাস দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট প্রমাণ করছিল যে, বুদ্ধের শিষ্যরা 'মত্তিয়া'কে পাবে। এখন উল্লেখিত গ্রন্থের উক্ত বর্ণনা এ দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ্তাআলা এ লোকদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে দু'দিক থেকে উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমত হযরত মসীহ্র সেই নামের কারণে, যা 'আদি পুস্তক' ৩ঃ১০* থেকে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ 'আসেফ' (নাম) যার অর্থ জাতিকে একত্রকারী। এ কারণে সেই দেশে তাঁর আগমন জরুরী ছিল যেখানে ইহুদীরা এসে বসবাস করছিল। দ্বিতীয়ত গৌতমবুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর ভক্তগণের তাঁকে (অর্থাৎ 'মুত্তিয়া'কে) দেখা ও তাঁর মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হওয়া জরুরী ছিল।

অতএব এ দুটি বিষয়কে একত্রে দেখলে নিশ্চিত বোঝা যায়, হযরত মসীহ্ অবশ্যই তিব্বতের দিকে গিয়েছিলেন। আর তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও রীতি-নীতি যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা-ও প্রমাণ করে যে, হযরত মসীহ্ তাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তদুপরি তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগীদের সর্বদা অপেক্ষমান থাকার বিষয়টি যেভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে এখনও লেখা আছে তা জোরালোভাবে প্রমাণ করছে যে, তাদের এ অধীর অপেক্ষা এদেশে হযরত মসীহ্র আগমনের পূর্বাভাষস্বরূপ ছিল। উপরোল্লেখিত বিষয় দু'টির পর কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বৌদ্ধধর্মের এমন বই-পুস্তক খোঁজার আর প্রয়োজন থাকে না যেগুলোতে লেখা থাকে যে, হযরত মসীহ্ তিব্বতে এসেছিলেন। কেননা বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারীর অপেক্ষা এত তীব্র ছিল যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিজ আকর্ষণে হযরত মসীহ্কে তিব্বতের দিকে অবশ্য টেনে এনেছিল।

স্মরণ রাখা আবশ্যক, বৌদ্ধ পুস্তকাবলীতে যে 'মুত্তিয়া' (*Metteyya*) নামটির প্রচুর উল্লেখ রয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহে মসীহ্। এইচ, টি, প্রিন্সেপ রচিত 'তিব্বত তাতার মঙ্গোলিয়া' (*Tibet, Tartary, Mongolia, by H.T. Prinsep*) গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় 'মত্তিয়া বুদ্ধ' যিনি প্রকৃতপক্ষে মসীহা তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে ঃ "প্রাথমিক (খ্রীষ্টান) মিশনারীগণ তিব্বতে গিয়ে যে অবস্থাবলী নিজ চোখে দেখেন ও কানে শোনেন সেসব অবস্থার প্রতি গভীর মনোসংযোগে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, লামাদের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে

** উদ্ধৃতিটির অর্থ সঠিক কিন্তু মনে হচ্ছে প্রথম সংস্করণে মুদ্রনজনিত ত্রুটি রয়েছে। অনুগ্রহ করে ৩:১০-এর পরিবর্তে ৪৯:১০ পড়ুন। (প্রকাশক- কাদিয়ান।)*

খ্রীষ্টধর্মের ছাপ বিদ্যমান।" এরপর সে গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ "এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সেসব প্রাথমিক খৃষ্টান ধারণা করেন যে, হযরত মসীহ্র হাওয়ারীরা জীবিত থাকা কালেই খৃষ্টধর্মের শিক্ষা ও প্রচার এ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল।" অতঃপর ১৭১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ "এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সে সময় একজন মহান পবিত্রাত্মার আবির্ভাবের জন্যে সাধারণভাবেই এক অপেক্ষা বিরাজ করছিল। এ সম্পর্কে টেসিটাস (*Tacitus*) এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ 'অপেক্ষার কেন্দ্র-বিন্দু কেবল ইহুদীরাই ছিল না, বরং স্বয়ং বৌদ্ধধর্মই এ অপেক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল অর্থাৎ এ দেশে 'মত্তিয়া'-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।' এ ইংরেজী গ্রন্থের প্রণেতা একটি নোট লিখেছেন ঃ 'পিতাক্কাতায়ন' এবং 'আত্মা কথা' পুস্তকটিতে আরেকজন বুদ্ধের আবির্ভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে যাঁর আবির্ভাব গৌতম তথা শাখী মুনির এক হাজার বছর পরে হবে বলে লেখা আছে। গৌতম বর্ণনা করেন, 'আমি পঁচিশতম বুদ্ধ এবং 'গৌর বর্ণের মুত্তিয়া'র আগমন এখনও বাকি আছে, অর্থাৎ আমার পরে তিনি এদেশে আসবেন। তার নাম 'মুত্তিয়া' হবে এবং তিনি গৌর বর্ণের হবেন।' এরপর সে ইংরেজ গ্রন্থকার লিখেছেন, 'মসীহ্র সাথে 'মত্তিয়া' নামটির বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে।' মোট কথা, এ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে গৌতমবুদ্ধ পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তাঁর দেশে তাঁর জাতি ও তাঁরই অনুসারীদের মাঝে একজন মসীহ্ আগমন করবেন। একারণেই তাঁর ধর্মানুসারীগণ সর্বদা এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, তাদের দেশে মসীহা আসবেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে সে আগমনকারী বুদ্ধের নাম 'বাগওয়া মত্তিয়া' এজন্যে রেখেছেন যে, বাগওয়া' সংস্কৃত ভাষায় ফর্সা বা শ্বেতকায়কে বলা হয়। এবং হযরত মসীহ্ যেহেতু সিরিয়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, সেহেতু তিনি 'বাগওয়া' অর্থাৎ গৌর বর্ণের ছিলেন। যে দেশটিতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল অর্থাৎ মগধ, যেখানে 'রাজগৃহ' অবস্থিত, সে দেশের লোক কৃষ্ণকায় ছিল এবং গৌতম বুদ্ধ নিজেও কালো ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিকট আগমনকারী বুদ্ধের অকাট্য দুটি আলামত বলে গিয়েছিলেন।

এক, তিনি 'বাগওয়া' হবেন। অর্থাৎ গৌর বর্ণের হবেন।

দুই, তিনি 'মত্তিয়া' হবেন, অর্থাৎ, ভ্রমণকারী হবেন এবং বাইরে থেকে

আসবেন।

সুতরাং এসব লোক হযরত মসীহ্কে না দেখা পর্যন্ত সর্বদা এসব আলামতেরই অপেক্ষায় ছিল। এ ধর্ম বিশ্বাসটি প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর হওয়া উচিত যে, গৌতমবুদ্ধের পাঁচশ' বছর পর * 'বাগওয়া মুত্তিয়া' তাদের দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অতএব এ বিশ্বাসের সমর্থনে বৌদ্ধধর্মের কোন কোন গ্রন্থে মত্তিয়া অর্থাৎ মসীহা তাদের দেশে এসেছিলেন আর এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল বলে লেখা থাকলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, লেখা নেই, তবুও বুদ্ধ যেহেতু খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে এ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'বাগওয়া মত্তিয়া' তাদের দেশে আসবেন, সেহেতু উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জ্ঞাত কোন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এ ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারে না যে, সেই 'বাগওয়া মুত্তিয়া' যাঁর অপর নামটি হচ্ছে মসীহ্, তিনি এদেশে এসেছিলেন। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী বাতিল সাব্যস্ত হলে ধর্ম বাতিল হয়ে যায়। যে ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদও নির্ধারিত ছিল এবং গৌতমবুদ্ধ যে ভবিষ্যদ্বাণীটি বার বার তাঁর শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করেছিলেন, সেটি যদি যথাসময়ে পূর্ণ না হয়ে থাকে তাহলে গৌতমবুদ্ধের সম্প্রদায় গৌতমবুদ্ধের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়তো এবং বই-পুস্তকে এ কথা লেখা হতো যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। পক্ষান্তরে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার স্বপক্ষে আরেকটি প্রমাণ আমরা এই পাই যে, তিব্বতে সপ্তম শতাব্দীর সেসব গ্রন্থ হস্তগত হয়েছে যেগুলোতে 'মসীহ্' শব্দ মজুদ আছে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম লেখা আছে এবং এ শব্দটিকে 'মী শী হু' (*Mi-Shi-Ho*) করে উচ্চারণ করা হয়েছে এবং যে ফিরিস্তিটিতে 'মী শী হু' পাওয়া গিয়েছে, এর প্রণয়নকারী হলেন একজন বৌদ্ধ। (দেখুন, *A record of the Buddhist Religion by I. Tsing Translated by G. Takakusu.)* জে. টেকাকাসু একজন জাপানী। তিনি উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন এবং আই, সিং হলেন একজন চীনা পর্যটক। তাঁর গ্রন্থের পাদটীকায় এবং এর পরিশিষ্টে টেকাকাসু লিখেছেন ঃ একটি প্রাচীন গ্রন্থে 'মী শী হু' (মসীহ্) নামটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এ গ্রন্থটি সপ্তম শতাব্দীর।

** পাদটীকা ঃ এক হাজার অথবা পাঁচ হাজার বছর সংক্রান্ত মেয়াদসমূহ সঠিক নয়- গ্রন্থকার।*

সাম্প্রতিককালে এর অনুবাদ গ্রন্থটি *Clarendon Press Oxford* (ক্লারেন্ডন প্রেস, অক্সফোর্ড) থেকে জি টেকাকাসু নামের একজন জাপানী প্রকাশ করেছেন।* মোট কথা, এ গ্রন্থে 'মসীহ্' শব্দটি মজুদ রয়েছে। এথেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, এ শব্দটি বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের কাছে বাইরে থেকে আসে নি। বরং বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এ শব্দটি নেয়া হয়েছে। এ শব্দটিকে কখনও মসীহ্ বলে লেখা হয়েছে, আবার কখনও 'বাগ মুত্তিয়া' বলে লেখা হয়েছে।

যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলী থেকে আমরা পেয়েছি সেগুলোর একটি হলো, স্যার মোনিয়ের উইলিয়মস (*Sir Monier Williams*) প্রণীত 'বুদ্ধিজম'(*Buddhism*) গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ

'বুদ্ধের ষষ্ঠ শিষ্য 'ইয়েসা' নামের এক ব্যক্তি ছিলেন।' এ শব্দটি 'ইয়েসূ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু হযরত মসীহ (আঃ) গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ শ' বছর পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি ষষ্ঠ শিষ্য বলে অভিহিত হয়েছেন। স্মরণ রাখা আবশ্যক, প্রফেসর ম্যাক্সমুলার তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী' (লন্ডন)-এর অক্টোবর, ১৮৯৪ ইং সংখ্যায় ৫১৭ পৃষ্ঠায় উপরোল্লেখিত বিষয়বস্তুর এ ভাষায় সমর্থন করেন ঃ 'এ ধারণাটি কয়েকবার জনপ্রিয় লেখকগণ উপস্থাপন করেছেন যে, মসীহ্র ওপরে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা প্রভাব বিস্তার করেছিল।' এরপর তিনি আবার লেখেন,

'আজ পর্যন্ত এ জটিলতা নিরসনের চেষ্টা চলছে যেন এমন কোন সত্য ঐতিহাসিক উপায়ের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়, যে উপায়ে বৌদ্ধধর্ম মসীহ্র যুগে ফিলিস্তিনে পৌঁছেছিল।' এখন উদ্ধৃত কথাগুলোর দ্বারা বৌদ্ধধর্মের সেসব গ্রন্থের সমর্থন করা হয় যেগুলোতে লেখা আছে, 'ইয়েসা' গৌতমবুদ্ধের শিষ্য ছিলেন। কেননা ম্যাক্সমুলারের ন্যায় এত উঁচু স্তরের খৃষ্টান যখন একথা মেনে নিয়েছেন যে, হযরত মসীহ্র হৃদয়ের ওপর বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার নিশ্চয় প্রভাব পড়েছিল, তখন প্রকারান্তরে এরই নাম হচ্ছে শিষ্য হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা এরূপ ভাষা বা শব্দাবলীকে হযরত মসীহ্র প্রতি মর্যাদা হানিকর এক

** দেখুন, উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১৬৯ এবং ২২৩ - গ্রন্থকার।*

ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবি বলে মনে করি। তবে বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাদিতে যে লেখা হয়েছে, 'ইয়েসু' বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন এটা কেবল এ জাতির পুরোহিতদের এক চিরাচরিত স্বভাব বিশেষ যে, তারা পরবর্তীকালে আগমনকারী সিদ্ধপুরুষকে পূর্ববর্তী সিদ্ধপুরুষের শিষ্য বলে মনে করে নেন। তাছাড়া যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি, হযরত মসীহ্র শিক্ষা এবং বুদ্ধের শিক্ষার মাঝে অতি গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। আবার গৌতম বুদ্ধ যেহেতু হযরত মসীহ্র পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন, সে দিক থেকে বুদ্ধ এবং মসীহ্র মাঝে পীরি-মুরিদীর সম্পর্ক রচনা করা একেবারে অসঙ্গত ধারণা নয়, যদিও এটা শিষ্টাচার বিরোধী। কিন্তু আমি ইউরোপের গবেষকদের এ গবেষণা-পদ্ধতিটিকে কখনও পছন্দ করতে পারি না যে, তারা এ কথার অনুসন্ধানে লেগে রয়েছেন, কোনোভাবে যেন খোঁজ করা যায় বৌদ্ধধর্ম মসীহ্র যুগে ফিলিস্তিনে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার আফসোস হয়, যেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন বই-পুস্তকে হযরত মসীহ্র নাম এবং এর বিবরণ রয়েছে, সেখানে কেন এ গবেষকগণ এরূপ বাঁকা পথ অবলম্বন করেন যে, তারা ফিলিস্তিনে বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন খোঁজেন এবং কেন তারা হযরত মসীহ্র মোবারক কদম নেপাল, তিব্বত ও কাশ্মীরের পাহাড়-পর্বতে তালাশ করেন না! কিন্তু আমি জানি, এত বড় সত্যতাকে সহস্র সহস্র অন্ধকার পর্দার আড়াল থেকে উদ্ঘাটন করা তাদের কাজ ছিল না। বরং এটি সেই খোদার কাজ ছিল, যিনি আকাশ থেকে দেখেন, সৃষ্টি-পূজা সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রুশের উপাসনা এবং মানুষের এক কাল্পনিক রক্তের আরাধনা কোটি কোটি মানব হৃদয়কে সত্য খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তখনই তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ক্রুশ-ভিত্তিক এ সকল বিশ্বাসকে খন্ডন করার উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদের একজনকে দুনিয়ায় 'মসীহ্ নাসেরী'র নামে পাঠিয়েছেন। আর প্রাচীন ওয়াদা অনুযায়ী তিনি (অর্থাৎ সে বান্দা) মসীহ্ মাওউদ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তখনই ক্রুশ ভঙ্গের সময় এসে গেল অর্থাৎ সেই সময়, যখন ক্রুশীয় বিশ্বাসের ক্রটিকে একটি কাষ্ঠকে দ্বিখন্ডিত করার ন্যায় সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হবে। অতএব আকাশ এখন ক্রুশ-ভঙ্গের সকল পথ খুলে দিয়েছে, যাতে সত্যান্বেষী প্রত্যেক ব্যক্তি এখন উঠে এবং তালাশ করে। মসীহ্র দেহসহ আকাশে যাওয়া যদিও একটা ভুল (ধারণা) তবুও এতে এক রহস্য ছিল। তা এই যে, মসীহ্র প্রকৃত জীবন

বৃত্তান্ত হারিয়ে গিয়েছিল এবং তা কবরে কোন দেহকে মাটি গ্রাস করে ফেলার ন্যায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। আকাশে সে প্রকৃত সত্যের এক অস্তিত্ব ছিল। মূর্তিমান এক মানুষের ন্যায় আকাশে তা মজুদ ছিল। আর শেষ যুগে সে প্রকৃত সত্যের পুনঃ অবতরণ অবধারিত ছিল। অতএব এখন মসীহ্ সংক্রান্ত সেই প্রকৃত সত্য মূর্তিমান এক মানুষের মত অবতীর্ণ হয়ে ক্রুশকে ভেঙ্গে দিয়েছে। মিথ্যা বলা ও অসত্যের সমর্থন সম্পর্কিত খারাপ স্বভাবগুলোকে আমাদের পবিত্র নবী (সাঃ) ক্রুশ সংক্রান্ত হাদীসে 'খিনযীর' তথা শূকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেগুলো ক্রুশ ভঙ্গের সাথে সাথে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যেমন একটি শূকর তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়। এ হাদীসের এ অর্থ করা সঠিক নয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ কাফিরদের কতল করবেন এবং ক্রুশগুলোকে ভাঙবেন। বরং ক্রুশ ভঙ্গের দ্বারা বোঝায়, এ যুগে আকাশ ও পৃথিবীর খোদা এমন এক গোপন প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করে দেবেন, যদ্দরুন সমগ্র ক্রুশীয় সৌধ সহসাই ভেঙ্গে পড়বে। আর 'খিনযীর হত্যা' বলতে না মানুষকে বোঝায়, না শূকরকে বোঝায়। বরং শূকরদের স্বভাব-চরিত্রকে বোঝায় অর্থাৎ মিথ্যায় হঠকারিতা এবং বারবার মিথ্যাকেই তুলে ধরা, যা এক ধরনের মলভক্ষণ বিশেষ। অতএব মৃত শূকর যেভাবে আর মলভক্ষণ করতে পারে না, তেমনি এখন সে সময় আসছে বরং এসে গেছে, যখন খারাপ স্বভাবগুলোকে এ ধরনের মলভক্ষণ থেকে বিরত রাখা হবে। ইসলামের আলেমগণ মহানবী (সাঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবনে ভুল করেছেন। ক্রুশ ভঙ্গের ও শূকর হত্যার প্রকৃত অর্থ তা-ই, যা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি। এ-ও তো লেখা আছে যে, মসীহ্ মাওউদের যুগে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং আকাশ থেকে এমন সব উজ্জ্বল সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে, যা হক্ ও বাতিলের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেখিয়ে দেবে। অতএব এমনটি কখনও ধারণা করো না যে, আমি তলোয়ার চালাতে এসেছি। না, বরং সকল তলোয়ার কোষবন্দি করতে প্রেরিত হয়েছি। দুনিয়া অন্ধকারে অনেক কুস্তি লড়েছে। অনেকে তাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্খীদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, দরদী বন্ধুদের মনঃকষ্ট দিয়েছে এবং প্রিয়দের জখম করেছে। কিন্তু এখন আর অন্ধকার থাকবে না। রাত গত হয়েছে, দিন উদিত হয়েছে। ধন্য সে ব্যক্তি, যে এখন বঞ্চিত হয় না।

বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি থেকে যে সকল সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ আমরা খুঁজে পেয়েছি এগুলোর একটি হচ্ছে সেই সাক্ষ্য যা ওল্ডেনবার্গ রচিত 'বুদ্ধিজম' গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে 'মহাওয়াগা' পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠা, ১ম পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতি মূলে লেখা আছে ঃ 'গৌতম বুদ্ধের 'রাহুলতা' নামের একজন স্থলাভিষিক্তও গত হয়েছেন, যিনি কেবল তাঁর আত্মোৎসর্গীকৃত শিষ্যই ছিলেন না, বরং তিনি তাঁর পুত্র ছিলেন।' এখন এ স্থলে আমরা দাবীর সাথে বলছি, বৌদ্ধ ধর্মের বই-পুস্তকে যে রাহুলতা নামের উল্লেখ এসেছে, এ শব্দটি 'রুহুল্লাহ' নামেরই পরিবর্তিত রূপ। এটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক নাম। আর এ 'রাহুলতা' গৌতম বুদ্ধের পুত্র ছিল, যাকে তিনি দুগ্ধপানরত অবস্থায় ফেলে দিয়ে কোন দূরদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকেও ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে, তাকে না জানিয়ে ও চিরবিচ্ছেদের নিয়্যতে অন্য কোন দেশে ভেগে গিয়েছিলেন। এ কেস্সাটি একেবারেই বাজে ও অহেতুক এবং বুদ্ধের মর্যাদা বিরোধী বলেই প্রতীয়মান হয়। এমন কঠোর হৃদয়, যালেম-স্বভাব ব্যক্তি, যে তার অসহায় স্ত্রীর প্রতি একটুও দয়া করে নি- তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে, তাকে কোন রকম আশ্বাস না দিয়ে চোরের ন্যায় কেটে পড়ে এবং দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিসর্জন দেয়- না তালাক দেয়, না অনির্দিষ্ট কালের সফরে যাওয়ার জন্য অনুমতি নেয়। বরং হঠাৎই নিজের নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ায় স্ত্রীর মনে চরম আঘাত দিল, তাকে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করালো। তাকে কোন চিঠি পর্যন্ত পাঠালো না। এমন কি, পুত্র যুবকে পরিণত হলো। দুগ্ধপোষ্য পুত্রের প্রতিও দয়া করল না। এমন ব্যক্তি কখনও সত্যপরায়ণ মহাপুরুষ হতে পারেন না যিনি তাঁর সেই নৈতিক শিক্ষারও ধার ধারলেন না, যে শিক্ষা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রদান করতেন। আমাদের বিবেক এ বৃত্তান্তটিকে মেনে নিতে পারে না যেমন ইঞ্জিলে বর্ণিত এ গল্পটিকে মেনে নিতে পারে না যে, মসীহ্ কিনা তাঁর মায়ের আসায় ও তাঁকে ডাকায় কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বরং এমন কথা বলে ফেলেন যা মায়ের অমর্যাদার কারণ ছিল।

অতএব স্ত্রী এবং মায়ের মনে আঘাত দেয়ার এ গল্প দুটোতে যদিও বুদ্ধ ও মসীহ্র মাঝে পরস্পর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু আমরা সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধ থেকেও স্খলিত এমন বৃত্তান্ত হযরত মসীহ্ বা গৌতম

বুদ্ধের কারও প্রতিই আরোপ করতে পারি না। স্ত্রীর প্রতি বুদ্ধের স্নেহ-ভালবাসা না-ই বা ছিল, তবে কি অবলা নারী ও স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতিও তাঁর কোন দয়া-মায়া ছিল না? এ এমন এক গুরুতর অসদাচরণ যে, শত শত বছর আগের এ বৃত্তান্তটি শুনে এখনও আমাদের কষ্ট দেয়, কেন তিনি এমনটি করলেন। মানুষের পক্ষে তার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রদানে অবজ্ঞা তার পাপী হবার জন্যে যথেষ্ট। তবে সে স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা ও স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় অথবা অধার্মিক, অহিতাকাঙ্খী ও প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ভিন্ন কথা। অতএব আমরা এমন নোংরা কার্যকলাপ বুদ্ধের দিকে আরোপ করতে পারি না, যা স্বয়ং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলীরও পরিপন্থী। অতএব এ যুক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, এ গল্পটি অসত্য। প্রকৃতপক্ষে রাহুলতা বলতে হযরত ঈসাকে বোঝায়, যাঁর একটি নাম হচ্ছে 'রূহুল্লাহ্'। হিব্রু ভাষায় 'রূহুল্লাহ্' শব্দটি 'রাহুলতা' শব্দের সাথে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর রাহুলতা তথা রূহুল্লাহ্কে পূর্বোল্লেখিত কারণেই বুদ্ধের শিষ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ মসীহ্ যে পরে এসে বুদ্ধের সদৃশ শিক্ষা আনয়ন করেন সেজন্যে বৌদ্ধধর্মের লোকেরা সে শিক্ষার মূল উৎস বুদ্ধকে নির্ধারণ করে মসীহ্কে তাঁর শিষ্য আখ্যা দিয়ে দেয়। আবার বুদ্ধ খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম (ঐশী-বাণী) পেয়ে হযরত মসীহ্কে তাঁর পুত্র আখ্যা দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে একটি বড় যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, এ গ্রন্থেই লেখা আছে যে, রাহুলতাকে যখন তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো তখন 'মগ্দালিয়ানা' নামক বুদ্ধের এক শিষ্যা তাঁর জন্যে অন্তবর্তী দূত হিসেবে কাজ করেছিল। এখন লক্ষ্য করুন, মগ্দালিয়ানা নামটি প্রকৃত পক্ষে 'মগদলিনি' থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, মগদলিনি নামের একজন মহিলা হযরত ঈসার শিষ্যা ছিলেন। ইঞ্জিলে তার উল্লেখ রয়েছে।

সংক্ষেপে লেখা এ যাবতীয় সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, নিশ্চয় হযরত ঈসা (আঃ) এ দেশে এসেছিলেন। এ সকল সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদেও বৌদ্ধধর্ম- বিশেষত যা তিব্বতে প্রচলিত এবং খৃষ্টধর্মের মাঝে শিক্ষা ও পর্বাদির দিক দিয়ে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সাদৃশ্য বিদ্যমান তা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে হালকাভাবে দেখার বা এড়িয়ে যাবার অবকাশ নেই বরং এ সাদৃশ্য এতো বিস্ময়কর যে, অধিকাংশ

খৃষ্টান গবেষক বিশ্বাস করেন যে, বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে প্রাচ্যের খৃষ্টধর্ম এবং খৃষ্টধর্ম হচ্ছে প্রতীচ্যের বৌদ্ধধর্ম। দেখুন, কত অদ্ভূত ব্যাপার! মসীহ্ বলেছেন, 'আমি জ্যোতিঃ, আমি সত্যের পথ'। ঠিক এ কথাই বৌদ্ধও বলেছেন। ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্কে পরিত্রাতা আখ্যা দেয়া হয়েছে। গৌতমবুদ্ধও নিজেকে পরিত্রাতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন 'লালতা ওসোত্তরা'। ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মসীহ্র পিতা ছিল না। তেমনি গৌতম বুদ্ধের জীবন চরিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই পিতা ছাড়া জন্মলাভ করেছিলেন, যদিও বাহ্যত হযরত মসীহ্র পিতা ইউসুফের ন্যায় তাঁরও পিতা ছিল। এ-ও লেখা আছে যে, বুদ্ধের জন্মের সময় একটি নক্ষত্র উদিত হয়েছিল। হযরত সোলায়মানের আদেশে একটি শিশুকে দ্বিখন্ডিত করে দুজন মহিলাকে দেয়ার গল্পটিও রয়েছে যা গৌতম বুদ্ধের 'জাতকা'য়* লেখা আছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মসীহ্ যেমন এদেশে এসেছিলেন, তেমনি ফিলিস্তিন থেকে এদেশে আগত ইহুদীদের সম্পর্কও বৌদ্ধধর্মের সাথে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলীতে বিশ্বসৃষ্টির যে ধারা ও পদ্ধতি লেখা আছে সেটিরও তওরাতের বর্ণনার সাথে অনেক মিল রয়েছে। আর তওরাত থেকে যেমন পুরুষ মর্যাদায় নারী থেকে শ্রেষ্ঠ বলে জানা যায় তেমনি বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী একজন যোগীর মর্যাদা একজন যোগিনীর চেয়ে বেশি বলে বিবেচিত হয়। বুদ্ধ জন্মান্তর্বাদ মানলেও কিন্তু তাঁর জন্মান্তর্বাদের বিশ্বাস তওরাতের শিক্ষার পরিপন্থী নয়। তাঁর মতে জন্মান্তর্বাদ তিন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

(১) কোন মৃত মানুষের কৃত-কর্ম ও কর্মসাধনা আরেকটি নূতন দেহের সৃষ্টিকে চায়।

(২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই প্রকার জন্মান্তর্বাদ যা তিব্বতী বৌদ্ধরা তাদের লামাদের মাঝে কার্যকর হয়ে থাকে বলে মানেন, অর্থাৎ কোন বুদ্ধ বা 'বুদ্ধ সাতওয়া'র আত্মার কোন অংশ বর্তমান লামার মাঝে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ তার শক্তি,

** গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী যা বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রকাশক-কাদিয়ান*

স্বভাব, আত্মিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান লামার মাঝে এসে যায়। এবং তার আত্মা এর মাঝে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

(৩) জন্মান্তর্বাদের তৃতীয় প্রকারটি হচ্ছে, ইহজীবনে বিভিন্ন ধরনের জন্মের মধ্য দিয়ে মানুষ অতিক্রম করতে থাকে। এমনকি, অবশেষে প্রকৃতভাবে তার নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষে পরিণত হয়। কখনও তার উপর এমন সময় আসে যখন সে যেন গরু হয়ে থাকে। আবার সে যখন লোভ ও দুষ্কর্মে বেড়ে যায় তখন সে কুকুরে পরিণত হয় এবং একটির অস্তিত্বের মৃত্যু ঘটলে প্রথমটির কৃত-কর্ম অনুযায়ী অপর অস্তিত্বটি সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে এ সমুদয় পরিবর্তন ইহজীবনেই সংঘটিত হয়ে থাকে। অতএব এ বিশ্বাসটিও ইঞ্জিলের শিক্ষার পরিপন্থী নয়।

আমি বর্ণনা করে এসেছি, বুদ্ধ শয়তানের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। তেমনি দোয্খ, বেহেশত, ফিরিশ্তা এবং কিয়ামতেও বিশ্বাস করেন। আর এ অভিযোগ যে, বুদ্ধ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তা নিছক মিথ্যা। বরং বুদ্ধ প্রচলিত বেদ এবং হিন্দুদের শরীরি খোদাগুলোকে অস্বীকার করেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেদের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। বর্তমান বেদকে সত্য বলে স্বীকার করেন না। এটাকে এক বিকৃত, প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত গ্রন্থ বলে মনে করেন। যে যুগে তিনি একজন হিন্দু হিসেবে বেদের অনুসারী ছিলেন সে যুগে তাঁর জন্মকে তিনি কুজন্ম বলে আখ্যায়িত করেন। সুতরাং তিনি ইশারায়-ইঙ্গিতে বলেন, 'আমি এক সময় পর্যন্ত বানরও ছিলাম, আবার এক সময় পর্যন্ত হাতী ছিলাম, তারপর হরিণে পরিণত হই। কুকুরও হই এবং চারবার সাপ হই। তারপর চড়ুইপাখি, এরপর ব্যাঙ হই। দুবার মাছ হই, আর দশবার বাঘে পরিণত হই। চারবার মোরগ এবং দু'বার শূকর এবং একবার খরগোশ হই। খরগোশরূপে থাকাকালে আমি বানর ও শৃগালদের এবং জলের কুকুরদের শিক্ষা দিতাম।' তিনি আরও বলেন, 'একবার আমি ভূত হয়ে যাই, একবার নারী এবং একবার নৃত্যকারী শয়তান হয়ে যাই।' এ সব ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা তিনি তাঁর জীবনের সেসব অবস্থাকে বুঝিয়ে দেন যা কাপুরুষতা, মেয়েলী আচার-আচরণ, অপবিত্রতা, হিংস্রতা, বিলাসিতা ও অতি ভোজনপ্রিয়তা এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। প্রতীয়মান হয় যে, এভাবে

তিনি তাঁর সেই সময়ের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন তিনি বেদের একজন অনুসারী ছিলেন। কেননা বেদকে পরিত্যাগ করার পর এদিকে তিনি আর কখনও ইঙ্গিত করেন নি যে, তারপরও তাঁর মাঝে অপবিত্র জীবনের কোন অংশ থেকে গিয়েছিল। বরং তারপর তিনি বড় বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ দাবী করেন এবং বলেন যে, তিনি খোদার প্রকাশস্থলে পরিণত হয়েছেন, নির্বাণ লাভ করেছেন। বুদ্ধ এ-ও বলেছেন, "মানুষ যখন দোযখী কর্মকান্ড নিয়ে দুনিয়া থেকে যায়, তখন তাকে দোযখে ছোঁড়া হয় এবং দোযখের প্রহরীরা তাকে দোযখের অধিপতির কাছে টেনে নিয়ে যায়। এ অধিপতির নাম 'ইয়ামাহ্'। সে দোযখীকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি সেই পাঁচজন রসূলকে দেখনি যাদেরকে তোমার অবগতির জন্যে পাঠানো হয়েছিল? তারা হচ্ছে ঃ

১. বাল্যকাল, ২. বৃদ্ধকাল, ৩. রোগ-ব্যাধি। ৪. অপরাধী হয়ে দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ, যা পরকালের শাস্তির এক প্রমাণ বহন করে। ৫. মৃতদের লাশ, যা দুনিয়ার লয়শীলতাকে নির্দেশ করে। অপরাধী উত্তর দেয়, 'জনাব! আমি আমার বোকামির দরুন এ সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি নি।' তখন দোযখের প্রহরীরা তাকে শাস্তির নির্দিষ্ট জায়গায় টেনে নিয়ে যাবে এবং তাকে আগুনে উত্তপ্ত এমন লোহার শিকলের সাথে বেঁধে দেবে যা আগুনের মতই রঙ ধারণ করবে।" বুদ্ধ আরও বলেন, 'দোযখের কয়েকটি স্তর আছে যেগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণীর পাপীদের ফেলা হবে।' এ সমুদয় শিক্ষা উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে যে, বৌদ্ধধর্ম হযরত মসীহ্র সাহচর্যের কল্যাণ হতে কিছু অর্জন করেছে। কিন্তু আমি এ স্থলে এ আলোচনাকে আরও বাড়াতে চাই না। পরিচ্ছেদটি এখানেই সমাপ্ত করছি। কেননা বৌদ্ধ ধর্মের বই-পুস্তকে এ দেশে হযরত মসীহ্র আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সেই সাথে আমরা মসীহ্র যুগে রচিত বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলীতে ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষা ও রূপক কাহিনীগুলো বিদ্যমান দেখতে পাই। এ দুটো বিষয়কে পরস্পর মিলিয়ে দেখলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, নিশ্চয় হযরত মসীহ্ এদেশে এসেছিলেন। অতএব যে সাক্ষ্য ও তথ্য-প্রমাণের আমরা বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি থেকে খোঁজ করতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ্তালার অনুগ্রহে তা পুরোপুরিভাবে আমাদের হস্তগত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঞ্জাব ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় হযরত মসীহ্‌র অত্যাবশ্যক আগমন সম্পর্কে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে সাক্ষ্য- প্রমাণ

স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশীয় বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পেয়ে কেন এ দেশে এলেন এবং কী সে প্রয়োজন ছিল যা তাঁকে এত দূরদূরান্তের ভ্রমণে উদ্যোগী করে তোলে? এ প্রশ্নের বিস্তারিতভাবে উত্তর দেয়া আবশ্যক বলে মনে হয়। এ বিষয়ে আগেও আমি কিছু আলোকপাত করে এসেছি। তবুও এ বিতর্কটি সামগ্রিকভাবে এ পুস্তকে তুলে ধরা সমীচীন বলে বোধ করছি।

অতএব জানা আবশ্যক, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর রিসালতের পদমর্যাদাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে পাঞ্জাব ও তদ্‌সংলগ্ন অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা একান্ত জরুরী ছিল। কেননা ইঞ্জিলে 'ইস্রাঈলের হারানো মেষ' বলে অবহিত বনী ইস্রাঈলের দশটি গোত্র এসব দেশে চলে এসেছিল। এ সত্যটিকে কোন ইতিহাসবিদ অস্বীকার করেন না। কাজেই এসব দেশের দিকে হযরত মসীহ্‌র সফর করা এবং এসব হারানো মেষের সন্ধান লাভ করে এদের কাছে খোদাতাআলার বাণী পৌঁছানো তাঁর জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। তা না করা পর্যন্ত তাঁর রিসালতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিষ্ফল হতো এবং অপূর্ণ থেকে যেত। কেননা আল্লাহ্‌তালার পক্ষ থেকে তাঁকে যেহেতু ইস্রাঈলের সেই হারানো মেষদেরকে বাণী পৌঁছাবার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছিল, সেহেতু সেই মেষগুলোর সন্ধান ও পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের পরিত্রাণ-ব্যবস্থার শিক্ষা না দিয়ে তিনি যদি এ ধরা থেকে বিদায় নিতেন, তাহলে তাঁর অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় হতো যাকে তার বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট করা হয় সে যেন এক বন্য গোত্রের মাঝে গিয়ে তাদের জন্যে একটি কুয়ো খনন করে তাদেরকে পানি সরবরাহ করে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি অন্য কোন জায়গায় তিন/চার বছর থাকার পর বিদায় নেয় এবং সেই গোত্রের

সন্ধানে এক পাও না বাড়ায়, তাহলে এহেন ব্যক্তি কি বাদশাহ্‌র আদেশ পালন করলো বলে গণ্য হবে? কখনও না। সে কেবল তার সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখার দরুন সেই গোত্রের প্রতি একটুও মনোযোগ দিল না।

তবে যদি প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে ও কী প্রমাণ দিয়ে জানা গেল যে, ইস্রাঈলের দশ গোত্র এ দেশে এসেছিল? এর উত্তরে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে যে, কোন সাধারণ ও মোটাবুদ্ধির মানুষও সেগুলোতে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। কেননা এসব অতি সুপরিচিত ঘটনা যে, আফগান এবং কাশ্মীরের আদি অধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে বনী ইস্রাঈল। যেমন, হাজারা জেলা থেকে দু'তিন দিনের যাত্রা পথের ব্যবধানে অবস্থিত 'আলাই' পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকে নিজেদেরকে বনী ইস্রাঈল বলে থাকে। তেমনি এতদঞ্চলে 'কালাডাকা' নামে আরেক পাহাড়ের অধিবাসীরাও নিজেদের বনী ইস্রাঈল হিসেবে পরিচয়ে গর্ববোধ করে। আবার স্বয়ং হাজারা জেলাতেও একটি গোত্র রয়েছে যারা নিজেদেরকে ইস্রাঈল বংশদ্ভূত বলে মনে করে। তেমনিভাবে 'চালাস' ও 'কাবুলের মাঝে দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পাহাড়গুলোর অধিবাসীরাও নিজেদের বনী ইস্রাঈল বলে পরিচয় বহন করে। কাশ্মীরের অধিবাসীদের সম্পর্কে ডঃ বার্ণিয়ের *(Dr. Bernier)* তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত-কাশ্মীর' (*Travels*)-এর ২য় খন্ডে কতিপয় ইংরেজ গবেষকের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রায়ের উদ্ধৃতি মূলে লিখেছেন যে, নিঃসন্দেহে কাশ্মীরী জাতি বনী ইস্রাঈল; তাদের বেশ-ভূষা, অবয়ব ও কিছু প্রথা-পর্ব সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেয় যে, তারা ইস্রাঈল বংশদ্ভূত। জর্জ ফাস্টার নামে এক ইংরেজ তাঁর রচিত গ্রন্থে লেখেন, 'আমি যখন কাশ্মীরে ছিলাম তখন আমার মনে হতো আমি যেন এক ইহুদী জাতির মাঝে বসবাস করছি।' ঠাকুর স্পিংক কং, কোলকাতায় প্রকাশিত এইচ ডাবলিউ বেলিউ. সি. এস. আই তাঁর রচিত 'দি রেসেস অফ আফগানিস্তান' *(The Races of Afghanistan by H.W. Bellews C.S.I. published by Thacker Spink & Co. Calcutta)* গ্রন্থে লিখেছেন, 'আফগানরা সিরিয়া থেকে আসে। নবুখদনিৎসর (বখ্‌তেনসর) তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং পার্সিয়া (*Persia*) ও মেড়িয়ায় (*Media*) তাদের আবাদ করে। পরবর্তী কোন সময়ে তারা ওই অঞ্চল থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে 'গওর' (*Ghor*) নামক পার্বত্য দেশে বসবাসরত হয়। সেখানে তারা বনী

ইস্রাঈল হিসেবে পরিচিত ছিল। এর প্রমাণ বহন করে ইদ্রিস নবীর এ ভবিষ্যদ্বাণী যে, ইস্রাঈলের সেই দশ গোত্র যাদেরকে বন্দী করে নেয়া হয়েছিল তারা বন্দিত্বের বন্ধন থেকে পালিয়ে 'আরসারাহ্' (*Arsarah*) নামক দেশে আশ্রয় নেয়। এটি সেই দেশেরই নাম বলে প্রতীয়মান হয় যা বর্তমানে হাজারাহ্ (*Hazara*) বলে সুপরিচিত এবং গওরে অবস্থিত। 'তাবাকাতে নাসেরী' নামক যে গ্রন্থটিতে চেঙ্গিস খাঁর আফগানিস্তান জয়ের বৃত্তান্ত রয়েছে এতে লেখা আছে, 'শম্বিসী' পরিবারের শাসনামলে এখানে এক জাতি বাস করতো যাদেরকে বনী ইস্রাঈল বলা হতো। তাদের মাঝে বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল। ৬২২ ঈসাব্দে যখন হযরত মুহাম্মদ (অর্থাৎ সেই সময়ে যখন সৈয়্যদনা হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) রিসালতের দাবী করলেন তখন এসব লোক হারাতের পূর্বদিকের অঞ্চলে বাস করতো। একজন কুরায়শ সর্দার খালিদ বিন ওলীদ তাদেরকে খোদার রসূলের পতাকার নিচে আনয়নের উদ্দেশ্যে তাঁর রিসালতের দাওয়াত পৌঁছালেন। তাদের পাঁচ/ছয় জন সর্দার নির্বাচিত হয়ে তাঁর সঙ্গে গেল। বড় জন ছিল কায়স, যার অপর নাম হচ্ছে 'কিশ্'। মুসলমান হয়ে ইসলামের পথে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এবং বহু বিজয় লাভ করে। এদের ফিরে যাওয়ার সময় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অনেক উপঢৌকন ও আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এ জাতি প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে। ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ আরও বলেন, সর্বদা এদের সর্দারগণ 'মালেক' (নৃপতি) উপাধিতে সুখ্যাত হতে থাকবে। তিনি কায়েসের নাম আব্দুর রশিদ রাখেন এবং তাকে 'পিতহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'পিতহান', শব্দটির সম্পর্কে আফগান লেখকগণ বর্ণনা করেন যে, এ একটি সুরিয়ানী শব্দ। এর অর্থ জাহাজের কর্ণধার। যেহেতু নও-মুসলিম কায়স তার জাতির পথ নির্দেশনার জন্যে জাহাজের কর্ণধার তুল্য ছিল সেহেতু তাকে পিতহান উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

কোন্ সময়ে গওরের আফগানরা এগিয়ে গিয়ে তাদের বর্তমান আবাসস্থল কান্দাহারে বসবাসরত হয় তা জানা যায় না। যথাসম্ভব ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে এমনটি ঘটেছে।

আফগানরা বিশ্বাস করে যে, কায়স খালিদ বিন ওলীদের মেয়ে

বিয়ে করেন। তাঁর থেকে তার তিন ছেলে জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম হচ্ছে ঃ সারাবান, পাতান ও গুরগাশ্ত। সারাবানের দুটি পুত্র ছিল যাদের নাম সাচার্জ ইউন্ ও কার্শ ইউন্। তাদেরই বংশধর হচ্ছে আফগান তথা বনী ইস্রাঈল নামে পরিচিত। এশিয়া মাইনর এবং পশ্চিমের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ আফগানদেরকে 'সুলেয়মানী' বলে অভিহিত করেন। ই. বেলফোর প্রণীত দ্য সাইক্লোপেডিয়া অফ ইন্ডিয়া, ইষ্টার্ণ এ্যান্ড সাউদার্ন এশিয়া (*The Cyclopaedia Of India, Eastern and Southern Asia by Edward Balfour*) -এর ৩য় খন্ডে* লেখা আছে ঃ ইহুদী জাতি মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে আছে। প্রাচীনকালে এসব লোক বহুল সংখ্যায় চীনদেশে বসবাস করতো। 'শু' জেলার সদর 'ইয়েহ চু'-তে এদের উপাসনালয় ছিল। ডঃ উল্ফ, যিনি বনী ইস্রাঈলীদের হারানো দশ গোত্রের অনুসন্ধানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তাঁর মতে আফগানরা যদি ইয়াকুবের বংশধর হয়ে থাকে তাহলে তারা ইহুদা ও বিন ইয়ামীন গোত্রগুলোর অন্তর্গত। আরেক সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা তাতারে নির্বাসিত হয়েছিল এবং বুখারা, মরো ও খিভার সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে এরা বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতো। তাতারী সম্রাট প্রেষ্টার জন কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এলেক্সেস কম্মিনসের নামে পাঠানো এক চিঠিতে তার দেশ তাতার সম্পর্কে উল্লেখ করে লিখেছেন 'এ নদীর (আমু) ওপারে বনী ইস্রাঈলের দশটি গোত্র রয়েছে। তারা যদিও নিজেদেরকে তাদের বাদাশাহ্র অধীনে আছে বলে দাবী করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা আমার প্রজা এবং দাস।'

ডঃ মূরের গবেষণায় প্রতীয়মান হয়, 'চোজান' (*Chosan*) নামক তাতারী গোত্রগুলো ইহুদী বংশদ্ভূত। তাদের মাঝে এখনও ইহুদী ধর্মের প্রাচীন রীতি-নীতি বিদ্যমান। সুতরাং তারা খত্নার নিয়ম পালন করে। আফগানদের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, তারা হচ্ছে বনী ইস্রাঈলের হারানো দশ গোত্র। সম্রাট নবুখদনিৎসর জেরূশালিম ধ্বংসের পর এসব ইহুদীকে বন্দি করে বামিয়ানের নিকটবর্তী গওর দেশে পুনর্বাসিত করেছিল। তারা খালিদ বিন ওলীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বরাবর ইহুদী ধর্ম মেনে চলতো।

** এটি প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ হবে। প্রকাশক- কাদিয়ান*

আফগানরা চেহারায় ও আকার-আকৃতিতে দেখতে ইহুদীদের মতই প্রতীয়মান হয়। তাদেরই ন্যায় ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করে থাকে।

একজন ফ্রেঞ্চ পর্যটক ফ্রেয়ার হারাত এলাকা অতিক্রম করা কালের বিবরণে লিখেছেন, এ এলাকায় বহুল সংখ্যায় বনী ইস্রাঈল রয়েছে। তারা নিজেদের ইহুদীধর্মের অনুশাসন পালন করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। টলেডো (স্পেন)-এর রিব্বি বিন্ইয়ামীন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া গোত্রগুলোর সন্ধানে বাড়ী থেকে বের হন। তিনি বর্ণনা করেন, এ সকল ইহুদী চীন, ইরান ও তিব্বতে বসবাসরত রয়েছে। জোসেফস '৯৩ইং সালে ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করেছেন। তিনি তাঁর ১১তম পুস্তকে উয্রা নবীসহ দাসত্বের বন্ধন থেকে ফেরৎ যাওয়া ইহুদীদের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ সে দশটি গোত্র এখনও ফুরাত নদীর ওপারে বসবাস করছে; তাদের সংখ্যা গণনাতীত। (ফুরাতের ওপার' বলতে পার্সিয়া ও পূর্বাঞ্চলকে বোঝায়)। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেন্ট জেরুম 'হোসীয়া' নবীর উল্লেখ করতে গিয়ে এ বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে টীকায় লিখেছেন, 'সেদিন থেকে (বনী ইস্রাঈলের) দশ গোত্র পার্থিয়া অর্থাৎ পারস্য সম্রাটের অধীনে রয়েছে এবং এখনও তাদেরকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করা হয় নি।' এ গ্রন্থেরই ১ম খন্ডে লেখা আছে, কাউন্ট জুয়েন স্টেরেম তাঁর প্রণীত গ্রন্থের ২৩৩-২৩৪ পৃষ্ঠায় লেখেন, আফগানরা একথা স্বীকার করে যে, নবুখদনিৎসর জেরুশালিমের উপাসনালয় (মন্দির) ধ্বংস করার পর বামিয়ান অঞ্চলে তাদেরকে নির্বাসিত করে (বামিয়ান আফগানিস্তানে অবস্থিত গওর অঞ্চলের সংলগ্ন)। জি. টি. ভিগন এফ. জি. এস ১৮৪০ সালে প্রণীত 'এ নেরেটিভ অফ এ ভিজিট টু গজনী, কাবুল এন্ড আফগানিস্তান' (*A Narrative of a Visit to Ghuzni, Kabul and Afghanistan by G.T.Vigne F.G.S,1840*) গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ মোল্লা খোদাদাদ 'মাজমাউল-আনসাব' গ্রন্থ থেকে পড়ে শুনালেন যে, ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল ইহুদা, তার পুত্র ছিল উস্রক, উস্রকের পুত্র একনুর, একনুরের পুত্র মাআ'লিব, মাআ'লিবের পুত্র ফার্লাই, ফার্লাইয়ের পুত্র ছিল কায়স, কায়াসের পুত্র তালূত, তালূতের পুত্র আরমেয়াহ্, আরমেয়ার পুত্র ছিল আফগান। তার বংশধর হচ্ছে আফগান জাতি। এ নামেই আফগান

নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আফগান নবুখদনিৎসরের সমসাময়িক ছিল এবং ইস্রাঈলী হিসেবে আখ্যায়িত ছিল। তার চল্লিশজন পুত্র ছিল। এদের ৩৪ তম ধাপে দু'হাজার বছর পর সেই কায়েস জন্ম হলেন, যিনি মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিলেন। তাথেকে ৬৪ টি প্রজন্ম গত হয়েছে। আফগানের সাল্‌ম নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরিয়া থেকে হিজরত করে হারাতের নিকটস্থ গওর মাশ্‌কুত এলাকায় বসবাসরত হয়। তার সন্তান-সন্ততি আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে।"

জেমস্ ব্রাইস এফ.জি.এস. প্রণীত এ সাইক্লোপিডিয়া অফ জিওগ্রাফি (লন্ডনে ১৮৫৬ ইং মুদ্রিত) *(A Cyclopedia of Geography by James Bryce, F.G.S. London, 1856)* -এর ১১ পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ 'আফগানরা নিজেদের বংশধারা ইস্রাঈলী বাদশাহ্ সাউলের সঙ্গে মেলায় এবং নিজেদেরকে ইস্রাঈলী বলে অভিহিত করে।" আলেকজান্ডার বার্নস্- এর উক্তি ঃ "আফগানরা তাদের এই প্রচলিত বিশ্বাস বর্ণনা করে যে, তারা বংশগতভাবে ইহুদী। বেবিলনের সম্রাট তাদেরকে বন্দী করে কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গওর অঞ্চলে এনে আবাদ করে। তারা ৬২২ ইং পর্যন্ত নিজেদের ইহুদী ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু খালিদ বিন আব্দুল্লাহ্ (ভুলবশত ওলীদের জায়গায় আব্দুল্লাহ্ লিখেছে) এ জাতির এক মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাদেরকে সে বছরই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করান।"

কর্ণেল জি. বি. মেলসন (১৮৭৮ ইং) প্রণীত 'হিষ্ট্রি অব আফগানীস্তান' *(History of Afghanistan by Col. G. B. Malleson London, 1878)* গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ "আব্দুল্লাহ্ খান হারাতী, ফ্রেঞ্চ পর্যটক ফ্রায়ের জন এবং স্যার উইলিয়াম জন্‌স (যিনি একজন খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ) এ বিষয়ে এক মত যে, আফগান জাতি বংশগতভাবে বনী ইস্রাঈল এবং তারা হারিয়ে যাওয়া দশ গোত্রের বংশধর।"

জি. পি. ফ্রায়ের* (ফ্রেঞ্চ) প্রণীত ও ক্যাপ্টেন উইলিয়াম এম, জেসি কর্তৃক অনূদিত এবং ১৮৫৮ ইং লন্ডনে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব দ্য আফগান্‌স'

** এটি জে. পি. ফ্রায়ের (Joseph Pierre Ferrier) হবে। উর্দুতে J (ج)-কে G (گ) হিসাবে লেখা হয়েছিল। কারণ, লেখকের সময়ে ی এবং ے -এর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য করা হয়নি। (প্রকাশক -কাদিয়ান)*

(History of the Afghans by J. P. Ferrier; translated by Capt.William Jesse, London, 1858) গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, প্রাচ্যের ইতিহাসবিদদের অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, আফগান জাতি বনী ইস্রাঈলের হারানো দশ গোত্রের বংশধরদের অন্তর্গত এবং এ অভিমত আফগানদের নিজেদেরও। এ ইতিহাসবিদ তাঁর একই গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ 'আফগানদের কাছে এ কথার প্রমাণস্বরূপ একটি দলিল আছে যা তারা এভাবে পেশ করে যে, নাদের শাহ্ যখন ভারতবর্ষ জয়ের অভিপ্রায়ে পেশোয়ার পৌঁছুলেন তখন 'ইউসুফ যেই' গোত্র তাঁর সমীপে ইরানী ভাষায় লেখা একটি বাইবেল সহ অন্যান্য কিছু জিনিস পেশ করলো, যা তাদের গোত্রে তাদের প্রাচীন ধর্মের অনুষ্ঠানাদি পালনের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। এ অভিযানে তার সাথে কিছু সংখ্যক ইহুদীও ছিল। এ জিনিসগুলো যখন তাদেরকে দেখানো হলো, দেখামাত্র তারা সেগুলো চিনতে পারলো।' এ গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠার পরে তিনি লেখেন, 'আব্দুল্লাহ্ খান হারাতীর অভিমত আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। সে অভিমতটির সার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ 'তালুত (সাউল) বাদশাহ্র দুজন পুত্র ছিল। একজনের নাম আফগান ও দ্বিতীয় জনের নাম জালুত ছিল। আফগান এ জাতির আদি পুরুষ ছিলেন। দাউদ ও সোলায়মানের রাজত্বের পর বনী ইস্রাঈলের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং প্রত্যেক গোত্র অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নবুখদনিৎসরের যুগ পর্যন্ত তাদের একই অবস্থা থাকে। নবুখদনিৎসর (*Nebuchadnezzar*) আক্রমণ চালিয়ে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে এবং শহর (জেরুশালেম) ধ্বংস করে দেয়। আর অবশিষ্ট ইহুদীদেরকে বন্দী করে বেবিলনে নিয়ে যায়। এ বিপদের পর আফগানের সন্তানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জুড়িয়া থেকে পালিয়ে এসে আরবদেশে বসবাসরত হয়। বহুকাল যাবৎ তারা সেখানে অবস্থান করে। কিন্তু পানি ও কৃষিজমির অভাব এবং মানুষজন ও জীব-জন্তুদের কষ্টের কারণে তারা ভারতবর্ষের দিকে চলে যেতে মনস্থ করে। আবদালীদের একটি গোত্র আরবদেশে থেকে যায় এবং (হযরত) আবূ বকরের খিলাফতকালে তাদের একজন সর্দার খালিদ বিন ওলীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে।..... যখন ইরানী আরবদের দখলে যায়, তখন এ জাতি আরবদেশ থেকে বেরিয়ে ইরানের ফারেস ও কির্মান অঞ্চলে গিয়ে বসবাসরত হয়। চেঙ্গিস খাঁর

আক্রমণকাল পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকে। তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আব্দালী গোত্র মাক্রান, সিন্ধু ও মুলতানের পথে হিন্দুস্তান পৌঁছায়। কিন্তু এখানেও শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটলো না। (অবশেষে) তারা কোহে সোলেমানে গিয়ে অবস্থান নেয়। আবদালী গোত্রের অবশিষ্ট লোকজনও সেখানে জমায়েত হয়। তাদের চব্বিশটি গোত্র ছিল যারা আফগানের বংশধর ছিল। তার তিন পুত্র ছিল। তাদের নাম হচ্ছে সারাবন্দ (সারাবান), এরকেশ (গুরগাশ্ত), কেরলান (বতান)। এদের প্রত্যেকের আবার আটজন করে পুত্র ছিল। (তাদের থেকে আবার) তাদেরই নাম অনুসারে চব্বিশটি গোত্র হয়। গোত্রগুলোসহ তাদের নাম নিচে দেয়া হল ঃ

সারাবন্দের পুত্ররা	গোত্রের নাম
আবদাল	আবদালী
ইউসুফ	ইউসুফ যাই
বাবূর	বাবূরী
ওয়াযীর	ওয়াযীরি
লুহান	লুহানী
বার্চ	বার্চী
খুগিয়ান	খুগিয়ানী
শারান	শারানী

গুরগাশ্তের পুত্ররা	গোত্রের নাম
খিল্জ	খিলজী
কাকর	কাকরী
জামুরীন	জমুরীনি
সাতুরিয়ান	সাতুরিয়ানী
পিন	পিনি
কাস	কাসী
তাকান	তাকানী
নাস্র	নাস্রী

কারলানের পুত্রেরা	গোত্রের নাম
খাটাক	খাটাকী
সুর	সুরী
আফ্রীদ	আফ্রীদি
তূর	তূরী
যায	যাযী
বাব	বাবী
বেঙ্গনেশ	বেঙ্গনেশী
লাম্ডিপুর	লাম্ডিপুরী

খাজা নেয়ামাতুল্লাহ্ হারাতী কর্তৃক সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে হিঃ ১০১৮ সালে প্রণীত এবং প্রফেসর বার্নহার্ড ডোরেন (খারকিউ ইউনিভার্সিটি) কর্তৃক অনূদিত ও ১৮৩৬ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মাখযানে আফগানী' * গ্রন্থের নিম্নবর্ণিত অধ্যায়গুলোতে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ
প্রথম অধ্যায়ে ইয়াকুব তথা ইস্রাঈলের ইতিহাস রয়েছে এবং এতে তাঁর থেকেই আফগান জাতির বংশধারা শুরু হয় বলে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তালূত বাদশাহ্র ইতিহাস দেয়া হয়েছে এবং এতে আফগানদের বংশ তালিকা তালূতের সাথে যোগ করা হয়েছে।

২২ ও ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, তালূতের দুই পুত্র ছিল- বরখিয়া এবং আরমিয়া। বরখিয়ার পুত্র ছিল আসেফ এবং আরমিয়ার পুত্রের নাম আফগান। ২৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,আফগানের ২৪** জন পুত্র ছিল। আফগানের সন্তানদের সমান সংখ্যক ইস্রাঈলের অন্য কোন গোত্রে সন্তানাদি ছিল না। ৬৫*** পৃষ্ঠায়

** পাদটীকা ঃ নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ যেমন - 'তারিখে তাবারী', যা মাজমাউল আনসাব, গুযীদা জাহাঁকুশায়ী, মাতলাউল আনওয়ার ও মা'দানে আকবর থেকে সংক্ষেপ করে এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেখুন, প্রণেতার পক্ষ থেকে দেয়া এর ভূমিকার পৃঃ– ৩।*

*** 40 হবে। *** মুদ্রণজনিত ত্রুটি। পৃষ্ঠা ২৫ হবে। প্রকাশক- কাদিয়ান*

লেখা আছে, নবুখদনিৎসর সমগ্র সিরিয়া দখল করে নেয় এবং ইস্রাঈলী গোত্রগুলোকে নির্বাসিত করে তাদেরকে গওর, গজনী, কাবুল, কান্দাহার ও কোহ ফিরোজের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এসব জায়গায় বিশেষভাবে আসেফ ও আফগানের বংশধারা বসবাসরত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, নবুখদনিৎসর বনী ইস্রাঈলকে সিরিয়া থেকে বের করে দিলে আসেফ ও আফগানের বংশের কয়েকটি গোত্র আরবদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরবরা তাদেরকে বনী ইস্রাঈল ও বনী আফগান নামে অভিহিত করতো।

এ গ্রন্থের ৩৭ এবং ৩৮ পৃষ্ঠায় মাজমাউল আনসাব (*Majma'ul Ansaab*) এবং তারিখ গুযিদা (*Taareekh Gozeeda*)-র প্রণেতা মুসতাওফি (*Mestoufi*) -কে উদ্ধৃত করে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় খালিদ বিন ওলীদ সেই আফগানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন যারা নবুখদনিৎসরের ঘটনার পর গওর অঞ্চলে বসবাসরত হয়েছিল। তালূতের বংশধারায় ৩৭তম ধাপে কায়সের নেতৃত্বে আফগান সর্দারগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) কায়সের নাম আব্দুর রশিদ রেখেছিলেন। এ স্থলে আব্দুর রশিদ কায়সের তালূত তথা সাউল পর্যন্ত বিস্তৃত বংশ তালিকা দেয়া হয়। আর এ-ও বর্ণনা করা হয় যে, নবী করীম (সাঃ) সরদারদেরকে পাঠান (পাতান) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এ শব্দটির অর্থ জাহাজের কর্ণধার (পথনির্দেশক)। কিছুকাল পরে তারা দেশে ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়।

'মাখযানে-আফগানী' গ্রন্থটিতেই ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ 'ফরিদুদ্দিন আহমদ তাঁর রচিত পুস্তক 'রিসালা আনসাব আফগানীয়া'-তে 'বনী আফগানাহ্ বা বনী আফগান' নাম সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ 'অগ্নি উপাসক নবুখদনিৎসর যখন ইস্রাঈল ও সিরিয়ার সব অঞ্চল জয় করে এবং জেরুশালিমকে ধ্বংস করে, তখন সে বনী ইস্রাঈলকে বন্দী করে কৃতদাস হিসাবে নির্বাসিত করে এবং মোসীয় শরীয়ত অনুসারী এ জাতির কয়েকটি

গোত্রকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায় এবং নির্দেশ দেয়, পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে তারা যেন খোদার পরিবর্তে তাঁর উপাসনা করে। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এ কারণে সে তাদের মাঝে দু'হাজার সংখ্যক সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে হত্যা করে আর অবশিষ্ট সকলকে সিরিয়াসহ তার সমগ্র রাজ্যের বাইরে কোথাও চলে যেতে আদেশ দেয়। তাদের একাংশ তাদের একজন সর্দারের নেতৃত্বে নবুখদনিৎসরের রাজ্য ত্যাগ করে গওর পার্বত্য দেশে চলে যায়। সেখানে তারা বসবাস করতে থাকে। দৈনন্দিন তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং মানুষে তাদেরকে বনী ইস্রাঈল, বনী আসেফ ও বনী আফগান নামে অভিহিত করে।'

৬৪ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রণেতার বক্তব্য ঃ 'প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী, যেমন তারিখে আফগানী, তারিখে-গওরী ইত্যাদিতে এ দাবী লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, বেশির ভাগ আফগান হচ্ছে বনী ইস্রাঈল, আর এদের কিছু অংশ কিবতি।' আবুল ফযল বর্ণনা করেন, কিছু সংখ্যক আফগান নিজেদেরকে মিশরী বলে মনে করে এবং এর এ কারণ পেশ করে যে, বনী ইস্রাঈল যখন জেরুশালিম থেকে মিশরে যায় তখন এ গোত্রটি (অর্থাৎ আফগান) ভারতবর্ষে হিজরত করে।"

ফরিদুদ্দিন আহ্মদ আবার ৬৪ পৃষ্ঠায় আফগান নামটির সম্পর্কে লিখেছেন ঃ আফগান নামটি সম্পর্কে কারও কারও মত হচ্ছে, সিরিয়া থেকে নির্বাসনের পর, তারা সব সময় তাদের মাতৃভূমিকে স্মরণ করে হা হুতাশ (আহ্ ও ফুগাঁ) করতো সে কারণে তাদেরকে আফগান নাম দেয়া হয়েছে। 'স্যার জন মেলকম এ রায়ই পোষণ করেন' দেখুন, 'হিষ্ট্রি অফ পার্সিয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ১০১।

আবার ৬৩ পৃষ্ঠায় মাহাবত খানের বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'তারা (অর্থাৎ আফগানরা) যেহেতু হযরত সুলেমানের অনুসারী ও আত্মীয়-স্বজন, সেহেতু আরবদেশের লোক তাদেরকে সুলেমানী আখ্যা দিয়েছিল।'

৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ 'প্রাচ্যের ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলের গবেষণায় এটাই প্রকাশ পায় যে, আফগান জাতির নিজেদের বিশ্বাস এটাই যে, তারা ইহুদী বংশোদ্ভূত।' এ রায়টিকে বর্তমানকালের কিছু সংখ্যক

ঐতিহাসিকও অবলম্বন করেছে অথবা খুব সম্ভব সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। ....আর আফগানরা নিজেদের নাম ইহুদী নামানুসারে রাখে এ প্রচলনটি তাদের মুসলমান হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে- অনুবাদক বার্ণহার্ড ডোরানের এ ধারণাটি কিন্তু কোন প্রমাণ বহন করে না।

পাঞ্জাবের উত্তর ও পশ্চিম অংশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিন্তু তাদের নাম কখনও ইহুদী নামানুসারে নয়। এতে স্পষ্টত জানা যায়, মুসলমান হয়ে যাওয়ার দরুন একটি জাতির মাঝে ইহুদী নাম রাখার প্রচলন ঘটে না। আফগানদের গঠন ও অবয়ব ইহুদীদের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিষয়টি সেই সকল গবেষকও মেনে নিয়েছেন যারা আফগানদের ইহুদী বংশোদ্ভূত হবার দাবীকে কোন গুরুত্ব দেন না। অথচ এটাই তাদের ইহুদীবংশোদ্ভূত হওয়ার বড় এক প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে স্যার জন ম্যালকমের বক্তব্য হচ্ছে ঃ "যদিও আফগানদের সম্মানিত (ইহুদী) বংশের অন্তর্ভূক্ত হবার দাবী অতি সন্দেহজনক। কিন্তু তাদের চেহারা, গঠন ও আকার-আকৃতি এবং তাদের অধিকাংশ রীতি-নীতি ও প্রথা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, তারা (আফগান) পার্সী, তাতারী ও হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র এক জাতি, আর কেবল এ বিষয়টিই এমন এক বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য বলে সাব্যস্ত করে, বহু শক্তিশালী তত্ত্ব-তথ্য যার বিপক্ষে যায় এবং এর পক্ষে কোন সরাসরি প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দৈহিক গঠন ও অবয়বে কোন এক জাতির সাথে অন্য জাতির সাদৃশ্যের কারণে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহলে কাশ্মীরীগণ তাদের ইহুদী গঠন ও অবয়বের দরুন অবশ্য-অবশ্যই ইহুদী বংশোদ্ভূত বলে সাব্যস্ত হবে এবং এ বিষয়টি কেবল বার্ণিয়েরই উল্লেখ করেন নি, বরং ফর্স্টার এবং যথাসম্ভব অন্যান্য গবেষকগণও বর্ণনা করেছেন। যদিও ফর্স্টার বার্নিয়েরের রায়টিকে স্বীকার করেন যে, তিনি কাশ্মীরীদের মাঝে অবস্থান কালে, ইহুদী লোকদের মাঝেই ছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।

এ. কে. জন্সটন (*A.K. Johnston*) প্রণীত 'ডিকশনারী অফ জিওগ্রাফী' (*Dictionary of Geography*)-র ২৫০ পৃষ্ঠায় কাশ্মীর শব্দ প্রসঙ্গে এ বাক্যগুলো লেখা রয়েছে ঃ

'এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহধারী, পৌরুষোচিত গঠন ও অবয়ব বিশিষ্ট; নারীরা ভরপুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সুদর্শনা- খাড়া নাক ও টানা চোখ, গঠনে ও অবয়বে হুবহু ইহুদীদের মত।'

সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেটে (*The Civil & Military Gazette*) (২৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখের সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত সওয়াতি ও আফ্রিদী (জাতিবর্গ) শিরোনামের এক নিবন্ধে লেখা আছে ঃ আমরা একটি উচ্চ পর্যায়ের অতি মূল্যবান কৌতূহল উদ্দীপক প্রবন্ধ পেয়েছি, যা বৃটিশ এসোসিয়েশনের মানবজাতির উদ্ভব সম্বন্ধীয় বিদ্যা সংশ্লিষ্ট শাখার সাম্প্রতিক একটি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত বিদ্যার গবেষণা কমিটির শীতকালীন অধিবেশনে শোনানো হবে, আমরা সম্পূর্ণ সে প্রবন্ধটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি ঃ

"ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পাঠান বা পাক্টান অধিবাসীদের বৃত্তান্ত প্রাচীন ইতিহাসগুলোতে মজুদ রয়েছে এবং এদের বহু গোত্র সম্পর্কে হেরোডটাস এবং আলেকজান্ডার ইতিহাস-লেখকরা উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগে এ পাহাড়ের নির্জন ও অনাবাদ অংশের নাম রোহ্ ছিল এবং এখানকার অধিবাসীদের নাম ছিল রোহিলা। এ রোহিলা বা পাঠানরা এ অঞ্চলে তখন থেকে আবাদ ছিল যখন আফগান জাতির কোন নাম-গন্ধ ছিল না। এখন সকল আফগানকে পাঠানদের মাঝে গণ্য করা হয়। কেননা তারা পাঠানী ভাষা অর্থাৎ পুশ্তু ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তারা এদের সাথে কোন আত্মীয় সম্পর্ক স্বীকার করে না। তাদের দাবী হচ্ছে যে তারা বনী ইস্রাঈল, অর্থাৎ সেসব গোত্রের বংশধর যাদেরকে নবুখদনিৎসর বন্দী করে বেবিলন নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু (পরে এখানে এসে) সবাই পুশ্তুভাষা অবলম্বন করে নেয় এবং এরা সবাই 'পাক্তানওয়ালী' নামের দেশীয় আইন-কানুনের সমষ্টিকে মেনে চলে। এর অনেক বিধি-বিধান মূসীয় শরীয়তের সাথে আশ্চর্যজনকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এর কতক বিধি-বিধান রাজপূত জাতিদের প্রাচীন রীতি-নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইস্রাঈলী ঐতিহ্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে লক্ষ্য করলে প্রতিভাত হয় যে, পাঠান গোত্রগুলো দুভাগে বিভক্ত হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমত সেসব গোত্র যারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত, যেমন ওয়াযিরী, আফ্রিদী, উরাক যাই ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত আফগান, যারা সেমেটিক হবার দাবী করে।

আমাদের সীমান্তে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। আর 'কাপ্তানওয়ালী' নামে এদের যে অলিখিত দেশীয় সংবিধান রয়েছে তা যথাসম্ভব এদের মিলিতভাবে তৈরী। এতে আমরা দেখতে পাই, মূসায়ী বিধি-বিধান রাজপুত রীতি-নীতির সাথে মিশে আছে, আবার মুসলিম রীতি-নীতি এগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সেই আফগান যারা নিজেদেরকে দুররানী বলে আখ্যা দেয় এবং যখন থেকে দুররানী রাজত্বের গোড়া পত্তন হয় অর্থাৎ ১৫০ বছর ধরে যারা নিজেদেরকে দুররানী বলে অভিহিত করে আসছে তারাও মূলত ইস্রাঈলী বংশোদ্ভূত বলে কথিত। তাদের বংশধারা তাদের একজন পূর্বপুরুষ 'কিশ' (কায়স) থেকে চলে আসছে যাকে হযরত মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) পাঠান অভিধায় ভূষিত করেছিলেন (সুরিয়ানী ভাষায় এ শব্দটি দ্বারা জাহাজের কাপ্তানকে বুঝায়)। কেননা তার পক্ষে ইসলামের স্রোত ধারায় তার লোকদেরকে (জাহাজের ন্যায়) পরিচালিত করা নির্ধারিত ছিল। আমরা যদি ইস্রাঈল বংশের সঙ্গে আফগান জাতির কোন প্রাচীন সম্পর্ক স্বীকার না করি তাহলে আমাদের পক্ষে তাদের মাঝে সাধারণভাবে প্রচলিত ইস্রাঈলী নামের কোন কারণ দর্শানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় এবং কতিপয় প্রথা, যেমন- 'ঈদে-ফাসাহ্'-এর উৎসব তাদের মাঝে প্রচলিত হবার কারণ বর্ণনা করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। যদি ধরা হয়, আফগানদের ইউসুফ যেই গোত্রটি ঈদে ফাসাহ্-এর তাৎপর্য না বুঝেই উদযাপন করে থাকে, তাহলে কমপক্ষে হলেও মানতে হয়, তাদের এ উৎসবটি ঈদে ফাসাহ্ কত অদ্ভূত অনুকরণ! তেমনিভাবে ইস্রাঈলী সম্পর্ক স্বীকার না করলে, আমরা উচ্চ শিক্ষিত আফগানদের এ ঐতিহ্যটি বর্ণনা করার ও এতে অটল থাকার কোন কারণ দর্শাতে পারবো না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ রীতিটির সত্যতার নিশ্চয় কোন প্রকৃত ভিত্তি রয়েছে। বেলিউ (*Bellows*) -এর অভিমত 'হচ্ছে, (আফগানদের) ইস্রাঈলী সম্পর্কটি প্রকৃতপক্ষেই সত্য হতে পারে। কিন্তু সে বর্ণনা করে যে, আফগানদের তিনটি বড় শাখার মাঝে যে শাখাটি নিজেদেরকে কায়সের বংশ বলে দাবী করে তাদের কমপক্ষে একটি শাখা 'সারাবূর' নামে অভিহিত এবং এ শব্দটি পুশ্তু ভাষায় প্রাচীন যুগে রাজপুতদের সূর্য বংশী বলে যে নামটি ছিল তারই অনুবাদ বটে। এ গোত্রটি চন্দ্র বংশীয় গোত্রের

সাথে মহাভারতের (বর্ণিত) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানে এসে বসবাসরত হয়েছিল। এভাবে জানা যায়, আফগানরা খুব সম্ভব ইস্রাঈলী, যারা প্রাচীন রাজপুতদের মাঝে এসে মিশে গেছে। আর এটাই সর্বদা আমার দৃষ্টিতে আফগানদের বংশগত মূল উৎস সম্পর্কীয় সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মোদ্দা কথা, বর্তমানকালের আফগানরা পুরুষানুক্রমিক জনশ্রুতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নিজেদেরকে মনোনীত জাতি অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীমের বংশধর হিসেবে গণ্য করে।....."

বিখ্যাত প্রণেতাদের গ্রন্থাদি থেকে যেসব উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরেছি তা একত্রে বিবেচনায় নিলে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন, যেসব আফগান ও কাশ্মীরী জাতি ভারতবর্ষ ও এর সীমান্তে ও আশপাশে রয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে বনী ইস্রাঈল। এ পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে ইনশাআল্লাহ্ আমি আরও বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করবো যে, হযরত মসীহ্র এ দূর-দূরান্তের সফর অর্থাৎ ভারতবর্ষের সফরের মূখ্য উদ্দেশ্য এটাই ছিল, যাতে তিনি সমগ্র বনী ইস্রাঈল জাতির কাছে সত্য প্রচারের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেন যা তাঁর উপর ন্যস্ত বলে ইঞ্জিলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অতএব তিনি হিন্দুস্তান ও কাশ্মীরে আগমন করেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পক্ষান্তরে তার প্রতি ন্যস্ত এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন না করে তিনি আকাশে উঠে গিয়ে থাকলেই বরং তা আশ্চর্য হবার কারণ হতো। এ আলোচনাটি আমি এখানে শেষ করছি।

শান্তি বর্ষিত হোক সে ব্যক্তির প্রতি, যে সত্যের নির্দেশনাকে অনুসরণ করে।

বিনীত

মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্
কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শ্রীনগরে- বনী ইস্রাঈলী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাযার গৃহের ভিতরের দৃশ্য ঃ উপরে- কবরের বহির্ভাগ এবং নীচে কবরের ছবি

- দি টেলিগ্রাফ, সানডে ম্যাগজিন, লন্ডন, জুন ৪, ১৯৭৮